শ্রীযুত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বন্ধুবরেষু

কাহিনী-সূচি

কাগজ সরবরাহ করেছেন বেঙ্গল পেপার মিলসের শ্রীযুত প্রতাপকুমার সিংহ।

মন্বন্তর

পাত্রপক্ষের প্রস্তাব ছিল বোটানিক্যাল গার্ডেনে। তাতে অমিতার মায়ের ঘোরতর আপত্তি—মাগো, বাইরের কত লোক বেড়িয়ে বেড়াবে, মেয়ে দেখানোর সময় হা করে চেয়ে রইবে, কি বিশ্রী! শেষে ঠিক হল, কোন্নগরের আড়পার তাঁদের এক আত্মীয়ের বাগানবাড়ি আছে—সেখানে গেলে কোন পক্ষের অসুবিধা হবে না, সে-ই সবচেয়ে ভাল।

দীঘির বাঁধানো চাতালে বসে আলাপ-পরিচয় হচ্ছে। পাত্রের মা অমিতাকে বড় পছন্দ করলেন; তাকে আদর করে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে নিজের হাতে মিষ্টি খাওয়ালেন। ওদিকে ভুবন মুখুজ্জেও হিরণকে বেহাই বলে ডাকতে শুরু করেছেন। বলেন, পাকাপাকি হয়ে যাক—[illegible] কম দেখিনি ভায়া, কিন্তু আমার চোখে লাগে তো গিন্নি বাতিল করেন; আবার দু'জনেরই পছন্দ হয়ে যায় তো কোষ্ঠি মেলে না। কলকাতার শহর তোলপাড় করে বেড়িয়েছি, কিন্তু পার [illegible] বলুন? আপনি যে মা-লক্ষ্মীকে কাশীপুরের [illegible] ভিতর [illegible] রেখে দিয়েছেন।

তাঁরা বিদায় হলেন। বিপিন সরকার এসে অবধি ফাই-ফরমাস খাটছে, এই তৃতীয় দফায় তরিতরকারি সংগ্রহ করে ফিরে এল—ঝুড়িভরতি পুঁইশাক ও নটের ডাঁটা, ডান হাতে দড়িতে ঝোলান দুটো মিঠেকুমড়ো। বলে, এখানে আর কিছু মিলবে না। বলেন তো ঘড়ি-ওয়ালা ঐ সাঁপুইদের বাগানে খোঁজ করি।

প্রভাবতী বলেন, থাকগে—অনেক হয়েছে। নেড়ে চেড়ে দেখে

খুশি মুখে তারিফ করতে লাগলেন, বাঃ বাঃ—তোমার পছন্দ আছে সরকার মশাই। কি রকম লকলকে ডগা, কি তেজালো!

বিপিন মহোৎসাহে বলে, শুনলাম মা ঘাটে এক একদিন টাটকা পোনামাছ বিক্রি হয়। গঙ্গার মাছ বড্ড মিষ্টি। মালিটাকে পাঠিয়ে দেব নাকি?

হিরণ বললেন, বিয়ে ঠিক হয়ে গেল বলে বিয়ের বাজারটাও সেরে যাচ্ছ নাকি? গন্ধমাদন যোগাড় করলে, নেবে কি করে? ট্যাক্সিতে যাবে না মোষের গাড়ি ঠিক করতে হবে দেখছি।

না বাবা, নৌকোয় যাব। অমিতা আবদার করে বলে, আবার গাড়িতে? বাপরে বাপ। রাস্তার ধুলোয় ভূত হয়ে গিয়ে তারপর এক প্রহর ধরে সাবান ঘষো। তার কাজ নেই, নৌকা ভাড়া কর বাবা। ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে, দুলে দুলে চলবে। চমৎকার!

খুব হাসি, খুব স্ফূর্তি। প্রভাবতী বলেন, হাসব না? ছেলে ছিল না, ছেলে আসছে ঘরে। এক মেয়ে বলে খুকীর বড্ড দেমাক। ভাগীদার আসছে, এবারে জারিজুরি ভেঙে যাবে।

অমিতা চুপি চুপি বলে, ভাগ আদায় করতে এলে কুশানের উপর পিন ফুটিয়ে রেখে দেব। খোঁচা খেয়ে পালাবার পথ পাবে না।

মালপত্র নিয়ে বিপিন সরকার এবং দু-জন মালি আগে আগে যাচ্ছে, এরা একটু পিছনে। ঘাটের কাছাকাছি এলে দশ-বারো জনে ছেঁকে ধরল।

কোথায় যাওয়া হবে কর্তা? এক্ষুনি নৌকো ছাড়ব। দু-দুখানা দাঁড়—উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

সম্মতির অপেক্ষা রাখল না, যে যা পারল কেড়েকুড়ে ছুটতে শুরু করেছে। বিপিন ছুটছে।

ভাল মজা তো—কি মতলব তোদের? দাঁড়া—

ঘাটে পৌঁছে সবাই ডাকছে, আমার এই নৌকো···আসুন কর্তা এই যে—

মৃদু হেসে হিরণ বলেন, এই আমার মেয়ে, এই পরিবার, ইনি সরকার মশাই আর এই আমি। একটা নৌকোয় যাবার বাসনা ছিল। তা তোমাদের খাতিরে চারজনের না হয় চারটে নৌকোই করলাম। বিশ জনের মন রাখব কি করে, বাছা?

নিজেদের মধ্যে তখন তুমুল বচসা বেধে গেল, সর্বপ্রথম কে কোন জিনিস টেনে নিতে পেরেছে। মীমাংসা হয় না, মারামারির যোগাড়। মহানন্দে এঁরা কৌতুক উপভোগ করছেন।

দক্ষিণে আঘাটার দিকে দেবদারু-ছায়ায় এক বুড়ো ডিঙি বেঁধে আপন মনে তামাক খাচ্ছিল। হিরণ এগিয়ে তার কাছে গিয়ে বলেন, ভাড়ায় যাবে না?

কেন যাব না? চড়নদার পেলেই যাই।

এমন জায়গায় বেঁধে বসে আছ। চড়নদার জানবে কি করে?

কি করি বাবু, বুড়োমানুষ—হাতাহাতি করে পেরে উঠিনে। ওরা এদিকে আসে না, বেশ চুপচাপ থাকা যায়।

ভাড়া জোটে?

বুড়ো বলে, তা জোটে বই কি কখনো কখনো। যে খায় চিনি, তারে জোটান চিন্তামণি। তা হুজুর, আমাদের তো চিনি নয়, দিনান্তে দু-মুঠো ভাত। কষ্টে স্বষ্টে চলে যায় একরকম। চড়নদারে না-ও যদি দেখে, আর একজন তো দেখছেন। তিনিই ঠেলেঠুলে নিয়ে আসেন। এই যেমন আপনাদের এনেছেন।

খিল-খিল করে হেসে অমিতা বলে, সে-তিনির আর কাজকর্ম নেই কিনা, তাই প্যাচপেচে কাদার মধ্যে মশার কামড় খেয়ে তোমার খদ্দের ঠেলে আনছেন!

ওদিকে ওদের বিবাদের আস্কারা হচ্ছে না। ঘড়ি দেখে ঘণ্টা-মিনিট ঠিক করে তো জিনিষ ধরেনি, গলাবাজি একমাত্র প্রমাণ। আর ঈশ্বর-দত্ত গলা আছে সকলেরই। শেষ পর্যন্ত নাজেহাল হয়ে তারা বলে, বাবু, আপনারা বলে দিন কোন নৌকো নেবেন।

প্রভাবতী বুড়োর ডিঙিটা দেখিয়ে দিলেন। ধর্মভীরু মানুষ, কেমন ঠাণ্ডা কথাবার্তা! বুড়োকে তাঁর বড্ড ভাল লেগেছে।

আর মাঝিরা আশ্চর্য হয়ে বলে, ভৈরব তো মোটে যায়ইনি আপনাদের কাছে।

হিরণ বলেন, জ্বালাতন করতে যায়নি। সেইজন্যেই যাব ঐ নৌকোয়। আর তোমাদের নামে যাচ্ছি থানায় রিপোর্ট করতে। প্যাসেঞ্জারের উপর রাহাজানি কর—সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে, তাতেও সমীহ নেই।

মাঝিরা তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখে। বাবু, ভৈরবের নৌকোর দাঁড়ি নেই। বোঠে বেয়ে যেতে যেতে রাত্তির হয়ে যাবে বললাম কিন্তু!

ভৈরব মাঝি এবার চোখ পাকিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলল, যা-যা-যা। হিরণকে বলে, ন-বছর বয়স থেকে এই কর্ম করছি, হুজুর। দাঁড়ি না থাক, পাল খাটিয়ে দেব। পাখনা মেলে উড়ে চলবে নৌকো। ওদের আগে গিয়ে পৌছব।

হিরণ বললেন, তাড়াহুড়োর কাজ নেই, তুমি ধীরে সুস্থে যেও মাঝি। যাব তো এই কুঠিঘাট। কতক্ষণ লাগবে?

ডিঙি ছাড়ল। ভৈরব ডাকে, ওঠ্ দিকিনি কেষ্ট। বেলা পড়ে এল, আর কত ঘুমুবি? পালটা খাটিয়ে দে, বাবা—

কেষ্ট ওঠে না। হাতের হুঁকাটা দিয়ে ভৈরব একটা খোঁচা দিল। কেষ্ট তাতে পাশ ফিরে শুল মাত্র।

হিরণ বলেন, ছেলে তোমার ভয়ানক আলসে।

আলসেমি নয় বাবু, ক্ষিধেয় নেতিয়ে পড়েছে। দুপুরে দু-পয়সার মুড়ি খেয়ে আছে। অত দরের চাল···তার উপর চড়নদারের এই অবস্থা। আপনার মতো ভদ্রলোক ক'জন আছে বাবু? ছেলেমানুষ—তা তো বুঝবে না! মুশকিল হয়েছে—কি যে করি ওকে নিয়ে—

প্রভাবতীর মায়ের প্রাণ মোচড় দিয়ে ওঠে। ডাকেন, খোকা—খোকা—ওরে কেষ্ট!

বাগানবাড়িতে সুপ্রচুর খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, মিষ্টি-মিঠাই যা বাড়তি ছিল ওখানে কিছু বিলি হয়েছে, আর নিয়ে যাচ্ছেন বাড়িতে চাকর-বাকর কতকগুলো রয়েছে তাদের জন্য। কেষ্ট ঘুমের মধ্যে চোখ মিটমিট করে দেখছে। প্রভাবতী হাঁড়ির মুখ খুলেছেন—আর কুকুর যেমন আ-তু-উ-উ—বললে ছুটে আসে, তেমনি এসে খাবার এক রকম কেড়ে নিয়ে কেষ্ট গব-গব করে চিবোতে লাগল। বড় ঘরের বউ প্রভাবতী—হাত থেকে এ রকম অসভ্য ভাবে ছিনিয়ে নিল···কিন্তু রাগ না হয়ে তাঁর চোখে জল এসে গেল। বলেন, আমার এই মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা হয়ে গেছে, মাঝি। বিয়ের দিন তোমার আর কেষ্টর নেমন্তন্ন রইল। যেও কিন্তু, নিশ্চয় যেও—

খেয়ে দেয়ে কেষ্টর বিষম ফূর্তি লেগে গেল। কথার জাহাজ ছেলেটা, কেবলই বক-বক করছে। অমিতার প্রায় সমবয়সি, তার সঙ্গে ভাব জমে উঠল। কি ওটা মাঝখানে? ভাসছে, দুলছে?

কেষ্ট যেন কত মুরুব্বি! বলে, কুমীর-কামট নয়—ওর নাম হল বয়া। বাতাস-পোরা রয়েছে কিনা, কিছুতে ডুববে না।

গল্প জমে ওঠে, একবার মাতলার গাঙে বাসন্তীর চরের উপর কেষ্ট একটা কুমীরকে বাছুর ধরতে দেখেছিল। কুমীরটা পড়েছিল, যেন জঙ্গলের একখানা কাঠ ভাসতে ভাসতে এসে লেগেছে। বাছুর ঘাস খেতে খেতে যেই না কাছে এসেছে, অমনি তার পিছনের দুই ঠ্যাং আর দেহের খানিকটা মুখে পুরে গড়াতে গড়াতে কুমীর জলে পড়ল। চাষারা ক্ষেতে কাজ করছিল, হৈ-হৈ করে এল। কিন্তু কে[illegible]র কি—তীরের কাছে জলটা একটু রাঙা হয়ে উঠল। ব্যস—আ[illegible] কিছু নেই।

বড় বড় গাঙে রাত দুপুরে এক কাণ্ড হয়ে থাকে, শোনো। জলের ঠিক উপর দিয়ে আলগোছে পা ফেলে জিন-পরীরা ছুটে বেড়ায়। শোঁ-শোঁ করে আওয়াজ আসে, মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে ওঠে...তাই থেকে বোঝা যায় বৃত্তান্ত। একবার এই ডিঙির গায়েই প্রায় ধাক্কা খেয়েছিল আর কি! টেমি নিভিয়ে দিয়ে এরা তখন নিঃসাড় হয়ে বসেছিল। বাপকে সাক্ষী মানে, না বাবা?

ভৈরব হাসিমুখে সায় দেয়। সে বলে, কিন্তু এই মা-গঙ্গার বুকে কোন দিন ওসব আসতে পারে না, খুকী দিদি! মাহাত্ম্য আছে কি[illegible]

অমিতা বলে, দু-ধারে এত ঘর-বাড়ি কল-কারখানা—এদে[illegible]র মধ্যে জাঁতিকলের মতো আটকা পড়ে যাবে, সেই ভয়ে আসে না।

বলে সে হেসে উঠল।

শেষে তাকেও গল্প বলতে হয়, অবোধ বড় বড় চোখ দুটি মেলে কেষ্ট চেয়ে থাকে। বইয়ে পড়া গল্প—এদের মতো স্বচক্ষে দেখা নয়। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা চিক-খাটানো সেকেলে বড়-বাড়ির মধ্যে সে মানুষ

হয়েছে, আকাশের চাঁদ সূর্য সেখানে উঁকি দিতে ভরসা পায় না। বাইরের আর কতটুকু দেখেছে! পায়ে হেঁটে নয়, বই পড়তে পড়তে মনের কল্পনায় অমিতা চলে যায় শিলাসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যে...কাঠ কাটছে আলিবাবা...দস্যুরা মণিরত্ন নিয়ে [illegible]...চিচিং-ফাঁক---গোপন ভাণ্ডারে পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য এনে জড় করে রেখেছে, বাপরে বাপ, চোখ ঝলসে যায়। দরজা খোলার মন্ত্র যারা জানে না, বনে জঙ্গলে না খেয়ে গাধা তাড়িয়ে কাঠ কেটে তাদের দিন কাটে।...আলিবাবা পথ পেয়ে গেছে।

খাসা গল্প, অতি চমৎকার গল্প। কেষ্ট উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ভৈরবও তারিপ করে। প্রত্যাসন্ন সন্ধ্যার ঝিলিমিলি আলোয় একবার মনে ওঠে, ঐ রকম একটা ভাণ্ডারের পথ পেলে কেষ্টকে সে সোনার থালে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজিয়ে খাওয়াত, কত খেতে পারে দেখত। দুধের ছেলে নিয়ে তাহলে কি গাঙে-খালে ঘুরে বেড়ায়? ঐ ফর্সা মেয়েটির মতো ঐ রকম রেশমি কাপড় পরিয়ে তাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রাখত, ঐ রকম প্রাণমাতানো বাস বেরুত কেষ্টর গা দিয়ে। দেখতে তো তাকে মন্দ নয়—যত্ন করতে পারেনা বলেই অমন রুক্ষ ছাই-ওড়া চেহারা!

খালের মুখ। বাতাস উঠেছে—গোলমেলে বাতাস। ঢেউ আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। আজকে ভরা পূর্ণিমা! পালে বাতাস বেধে ডিঙি কাত হয়ে পড়ল, এক ঝলক জলও উঠল।

সামলে...খুব সামলে। গাজি বদর বদর!

প্রভাবতী অমিতাকে জড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন। বিপিন সাহস দিচ্ছে, ভয় নেই মা, কোন ভয় নেই—

পালের দড়ি খুলে ফেল, ওরে কেষ্ট। কড়া হাতে বৈঠা ধরে

রয়েছে ভৈরব মাঝি, হাতের শিরা-উপশিরা ফুলে উঠেছে। বলে, ভয় কিসের মা-ঠাকরুণ? ঠাণ্ডা হন, নারায়ণের নাম করুন।

কেষ্টর বয়স কম, তাতে কি? এই রকম ক্ষেত্রে কি করতে হয়, সে ভাল রকম জানে। তাড়াতাড়ি পালের দড়ি খুলল। গ্রহের ফেরে ঠিক সেই সময়টা জোরে এল বাতাস। ডিঙি বোঁ করে পাক খেয়ে গেল। পালের কোণ বিষম বেগে আগলা হয়ে বেরুল। ছেলেমানুষ সামলাতে পারল না—সেই টানে একেবারে ধনুকের তীরের মতো ছিটকে পড়ল বিশ-পঁচিশ হাত দূরে খরস্রোতের মধ্যে।

ভাসছে আর চেঁচাচ্ছে, বাবা গো!

ভয় কি বাবা, কোন ভয় নেই। পা আর একহাত দিয়ে ভৈরব বৈঠা ধরে আছে—আর এক হাতে ছেলের দিকে গুণের দড়ি ছুঁড়ে দিচ্ছে। কেষ্ট ধরতে পারে না, ভেসে আরও দূরে চলে যাচ্ছে, এক হাতে দড়ি ঠিক মতো পৌঁছায় না। বিপিন এসে দড়ি ছুঁড়তে লাগল। উপোস করে করে গায়ে সে রকম বল নেই, তার উপর এতক্ষণ জল টেনে নিস্তেজ হয়ে এসেছে—দড়ি গায়ের উপর পড়লেও কেষ্ট ধরতে পারছে না। হিরণ প্রভাবতী অমিতা চেঁচামেচি করছে, কাছাকাছি একটা নৌকা দেখা যায় না। কেষ্ট ডুবছে আর ভাসছে, জলে ভুড়ভুড়ি ছাড়ছে, আবার প্রাণপণ প্রয়াসে মাথা জাগিয়ে ডাকছে, বাবা—বাবা!

ভয় নেই খোকা, ঠাকুর রক্ষে করবেন।

হিরণ অধীর কণ্ঠে বলেন, ঝাঁপ দিয়ে পড় বুড়ো, ওকে টেনে আন—

বোঠে ছাড়ি কি করে বাবু? বড্ড তুফান—সব সুদ্ধ তলিয়ে যাব।...দাঁড় টানতে পারবেন? জোরে—জোর করে—

বিপিন দাঁড়ে বসেছে। অনভ্যস্ত হাত। টানের মুখে বে-কায়দায় মচাৎ করে দাঁড় ভেঙে গেল। আর দরকার নেই, ছেলে জলতলে তলিয়ে গেছে। শক্ত মুঠোয় বৈঠা ধরে ভৈরব পাথরের মতো বসে, যেন তার সম্বিৎ নেই। নিষ্পলক সে চেয়ে আছে আবর্তিত জলধারার দিকে, যেখানে বাবা বলে ডাকতে ডাকতে অসহায় ছেলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাকা মাঝি ভৈরব—তার হাতে কোনদিন নৌকা বানচাল হয়নি, আজও হল না। আরও নৌকা এসে পড়ল। অনেক গণ্ডগোল ও হৈ-চৈয়ের পর তারা ঘাটে এসে পৌঁছল, তখন রাত্রি গভীর। ডিঙি বেঁধে ভাঁটা-সরে-যাওয়া কাদার উপরেই ভৈরব বসে পড়ল। এতক্ষণে হু-হু করে চোখে জল নেমে এল। দশ টাকার দু-খানা নোট প্রভাবতী তার হাতে গুঁজে দিয়ে একটা ভাড়াটে গাড়িতে তাঁরা উঠে বসলেন।

যে শোনে, সেই ধন্য-ধন্য করে। ছোটলোক হলে কি হয়, এমন কর্তব্যপরায়ণ বড়দের মধ্যেও মেলে না। মাঝিমাল্লা মানুষ—সাঁতার কেটে ছেলেটাকে নিশ্চয় বাঁচাতে পারত, কেবল এদের মুখ চেয়ে তা করল না।

ভৈরব মনে মনে ভাবে—আপনার জনদের মধ্যে বলেছেও এ কথা—কষ্ট দেখে মা-গঙ্গা তার ছেলেকে কোলে তুলে নিয়েছেন। পেট ভরে খেতে দিতে পারত না, খাওয়া নিয়ে কত বকাবকি, মারধোর! আর চালের দর দিন দিন যা হচ্ছে, এর পর কি ঘটবে বলা যায় না। তা এখন সমস্তই চুকে গেল, ভাবনার কোন-কিছু থাকল না আর।

আর সে হিরণদেরও খুব গুণগান করে। কুড়ি কুড়িটা টাকা দিয়ে গেল—আহা, ভাল হোক ওদের। অমন মন যাদের, তাদের ভাল

হবে বই কি! প্রভাবতী বলেছিলেন, টাকা-পয়সা[illegible] জীবনের দাম হয় না—আমরা তোমার কেনা হয়ে রইলাম, মাঝি।...দু-দুখানা নোটেও নাকি দাম শোধ হয়নি। বলে কি ওরা? বড্ড ভাল লোক—তাই অমন করে বলল। এক পয়সা না দিলেও কে কি করতে পারত,—আর ওদের কি দোষ? ভৈরব অন্তর দিয়ে আশীর্বাদ করে, নারায়ণ, ভাল কর ওদের—

ক'দিন শুয়ে বসে নানা চিন্তায় এই রকম কাটল। তারপর ঘাটে গিয়ে গলুয়ের উপর যে তার চিরকালের [illegible] বসে। এই পাঁচ-সাত দিনে ভয়ানক বুড়ো হয়ে পড়েছে, হাত আর চলতে চায় না। মাঝ-গঙ্গায় গিয়ে যে উন্মনা হয়ে পড়ে, জলের নিচে কে যেন ডাকছে, বাবা, বাবা! ভয় নেই খোকা, দড়ি ধর্। বৈঠা তাড়াতাড়ি জল থেকে তুলে ধরে, স্রোতের নিচে তার ছেলের মাথায় মেরে বসবে নাকি? ডিঙি ঘুরে গেল, সওয়ারিরা ভয় পেয়ে গালিগালাজ করে। ভৈরব ভাবে, তাই তো—এ রকম করে কোনদিন পরের ছেলে-মেয়ে ডুবিয়ে মারব নাকি? সে সামাল হয়ে জোর জোরে বৈঠা চালায়। কিন্তু কতক্ষণ? আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ভাবে, নৌকা বাওয়া আর হবে না দেখছি। কার জন্যে আর চালাব নৌকা? কুড়ি টাকা নগদ তবিলে রয়েছে, দিব্যি কেটে যাবে। যখন সে মোটে ন-বছরের ছেলে তার বাপ বৈঠা ধরতে শিখিয়েছিল, সেই বৈঠা এতকাল পরে ছেড়ে দিতে হল। [illegible] পরে সে ডিঙিটাও বিক্রি করল। আর ক'টা দিনই বা! এই ভাড়িয়ে চুরিয়ে চলে যাবে একরকম।

ধান-চালের দর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

চোদ্দপুরুষের মধ্যে কেউ কখনো শুনেছ, একটাকায় এক সের চাল? নারায়ণ, তোমার সংসারে অন্যায় বেড়েছে, তাই একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে নাকি? রাস্তায় এক মিনিট দাঁড়ানো যায় না, মৃত্যুর ছায়া মুখে নিয়ে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় শত শত মানুষ ঘিরে ফেলে। রাতে ঘুমুতে পারবে না, হাজার হাজার নরনারী কণ্ট্রোলের দোকানে নগদ দামে এক সের চাল কিনবার প্রত্যাশায় রাত্রি জাগছে, আধ হাত বসবার জায়গা নিয়ে তাদের কলহ-মারামারির অন্ত নেই। ভাতের ফেন পোষা-গাইটাকে দিয়েছি—কারা তক্কে তক্কে ছিল, ফেনের হাঁড়ি গরুর মুখ থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে মানুষ ডাষ্টবিন থেকে উচ্ছিষ্ট খায়। শত সহস্র ধুঁকছে ঘরের কোণে, রাস্তার উপর মরে পড়ে থাকছে। সকালবেলা খবরের কাগজে দেখ, আজকে বিরানব্বুই জন কুড়িয়ে নেওয়া হয়েছে, আজকে একশ একান্ন···

আর দেখ, দেখ—ওদের ঘরে অর্গান বাজছে, কলহাস্যের বিরাম নেই, মোটরের ভিড়ে রাস্তা চলা দায়, সিনেমা-হলে জায়গা পাওয়া যায় না—জিনিষের দাম বাড়ছে তিনগুণ পাঁচগুণ বিশগুণ। অফুরন্ত ওদের নোটের তাড়া, যেন নেশা ধরে গেছে ওদের। কুছ পরোয়া নেই—যে দামে হোক, কুপন যোগাড় কর—আন মোটরের তেল, কেন সোনা, কেন ধানচাল জায়গা-জমি। নারায়ণ, তোমার ধরিত্রীতে একমুঠো অন্ন পড়ে নেই—যেখানে যা ছিল ডাকাতেরা ভাণ্ডারে পুরে ফেলেছে। দরজা খোলার মন্ত্রটি যদি জানা যেত!

অবস্থা দেখে ভুবন মুখুজ্জে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। যখন

এখন তাগিদ দিচ্ছেন, একটা তারিখ সাব্যস্ত করুন, ভায়া। শ্রাবণের মধ্যে হয়ে যাক, নইলে আবার অকাল পড়ে যাবে। যা দিনকাল আসছে কে আছে কে নেই কিছু বলা যায় না। ছোট্ট মা'টিকে নিয়ে দুটো দিন আমোদ আহ্লাদ করে যাই।

হিরণ ইতস্তত করেন। এই মন্বন্তরের মধ্যে এখন কি বিয়ে-খাওয়ার সময়? খাবার জিনিষপত্র বাজার থেকে যেন উড়ে গেছে। পোড়াবার কয়লা—সে-ও বাঘের দুধের মতো অমিল। বরঞ্চ অঘ্রাণ কি মাঘমাসের দিকে—

ভুবন প্রবল বেগে ঘাড় নাড়েন। না-না-না—অবস্থা তখন আরও খারাপ হবে না, কে বলতে পারে? আমার কিছু দাবি-দাওয়া নেই ভায়া। অসুবিধা হয়, এক ভরিও সোনা দেবেন না—ফুলের গয়না দিয়ে মেয়ে সম্প্রদান করবেন।

ফুলের গয়না হিরণ দেবেন, যেহেতু ও-মেয়ের গায়ে ফুলের আরও বাহার খুলে যায়। কিন্তু সোনা-জহরতে মুড়ে দিতেও আটকাবে না—সোনার ভরি যদি দু'শো টাকাই হয়, হোক না কেন। অসুবিধা সে দিক দিয়ে হচ্ছে না। ধরুন, এখন শহরে আলোর কড়াকড়ি—ছাতে উঠানে হোগলা দিতে দেবে না, ত্রিপল দিয়ে ঢাকতে হলেও অনুমতির জন্য হাঁটাহাঁটি করতে হবে। সাত নয়, পাঁচ নয়, একটি মাত্র মেয়ে—তার বিয়ের রোসনাই হবে না, বাজি পুড়বে না, জাঁকজমক তেমন যে কিছু করা যাবে তা-ও মনে হচ্ছে না—

অবশেষে মুখ কালো করে ভুবন বললেন, আসল কথা কি এই, না মনে মনে আর কিছু আছে? খোলসা করে বলুন।

শেষ পর্যন্ত মত দিতে হয়। ছাব্বিশে শ্রাবণ বিয়ে। সর্বাংশে উপযুক্ত পাত্র—হাতছাড়া করা চলে না। বিশেষত ওঁদের যখন এত আগ্রহ।

মন্দিরের সামনে ভৈরব ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। দুপুরবেলা ঠাকুরের ভোগ দিয়ে জন পঁচিশকে এরা প্রসাদ বাঁটোয়ারা করে দেয়। পাকা ভোগ—মিহিচালের সুগন্ধ অন্ন। তারই মতো একজন খুব গোপনে তাকে খবরটা দিয়েছে। বেশি লোক জানাজনি হয়নি; সকালবেলা সকলের আগে এসে দাঁড়িয়েছে, নির্ঘাৎ সে পেয়ে যাবে। কিন্তু যেন তারে তারে খবর হয়ে যায়। এক প্রহর হতে না হতে লোকারণ্য হয়ে গেল। দরজা খুলতেই মারামারি খুনোখুনি ব্যাপার। মানুষ ভাতের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে। মায়ামমতা স্নেহসৌজন্য নেই, ভাত চাই—ভাত। পিছনের ধাক্কা খেয়ে বুড়ো ভৈরব মাটিতে পড়ে গেল, তাকে পায়ে পিষে হৈ-হৈ করে লোকগুলো ঢুকছে। সেবাইত ঠাকুরের দুই গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে লাঠি দিয়ে দমাদম পিটছে—বেরো, বেরো—পঁচিশ জন পুরে গেছে।

ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ভৈরব উঠল। পাঁচদিন—পুরো পাঁচটা দিন ও রাত্রির মধ্যে মুখে ভাত ওঠেনি। ভাত খাওয়া যেন ভুলে গেছে। একটা পচা তাল জোগাড় করেছিল এক তরকারিওয়ালার কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে। এই মাত্র পেটে গেছে। কোথায় যাবে সে? নারায়ণ, তোমার দুয়ারে এসেছিলাম—খেয়ে গেলাম লাঠির বাড়ি। ঢাক ঢোল বাজিয়ে পুজো হচ্ছে, ওর মধ্যে এদের কথা ঠাকুরের কানে ঢুকবে কি করে? গন্ধে পুষ্পে ধূপের ধোঁয়ার আচ্ছন্ন করে রেখেছে, ঠাকুর এদের দেখতে পান না। বড়লোকের মন্দিরে ঠাকুর আটকা পড়ে গেছেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। ভৈরব টলছে, আর চলতে পারে না। কৃপণ নিষ্করুণ পৃথিবী, তবু তার ধুলোয় হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। মস্ত বড়

এক খাবারের দোকান। ভৈরব ও তার মতো আরও বিস্তর লোক সামনে দাঁড়িয়ে। অজস্র খাবার সাজানো, শুধু একখানা মাত্র কাচের ব্যবধান। যাদের টাকা আছে, ঝনাঝন টাকা ফেলছে, কাচের ভিতর দিয়ে হাত চালিয়ে দিচ্ছে, হাত ভরতি বেরুচ্ছে মনোলোভা রকমারি খাবার। কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ওদিকে সারবন্দি ঝকঝকে চেয়ার-টেবিল। বিচিত্রবেশ নরনারী ঢুকছে, প্লেট পড়ছে টেবিলে আর বাইরে খাদ্য-প্রত্যাশীরা নিশ্বাস নিরুদ্ধ করে অপেক্ষা করছে ভাগ্যবানেরা খেয়ে-দেয়ে যখন উদ্গার তুলতে তুলতে বেরিয়ে যাবেন যদি ছিটে-ফোঁটা পড়ে এদিকে। কেউ তাকায় না—গটমট করে চলে যায়, রাস্তার উপরে অপেক্ষমান মোটরগুলো গর্জন করে ওঠে, ভকভক করে পিছনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে উপহাস করে চলে যায়। এরা ধুঁকছে, বাতাসে মুখ নাড়ছে, চলে বেড়াচ্ছে যেন কলের পুতুল। সুখাদ্যের কথা ভাবতে ভাবতে দুচোখ নিষ্প্রভ ও হৃদস্পন্দন মৃদুতর হয়ে আসে। ওদিকে—উঃ, খাবারের পাহাড়! নারায়ণ, তোমার মানুষের এত সঞ্চয়, এত প্রাচুর্য! মাঝখানে একখানি মাত্র কাচ। একটুকরা ইট ছুঁড়ে মারলেই ঝন-ঝন করে কাচ ভেঙে পড়বে— কে রুখবে? গুণতিতে ক'জন ওরা?···ভাঙো তবে ঐ ভঙ্গুর কাচের ব্যবধান—চুরমার করে দাও। ···না—না, সে হয় না।

কাচের আড়ালে ঐ জন আষ্টেক লোক যারা দেওয়া-থোওয়া করছে ভয় তাদের নয়। ধরে নিয়ে যাবে? জেল? সরকার বাহাদুর ঈশ্বরের চেয়ে দয়াবান—জেলের ভিতর এখনো ভাত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে, বাতাস খেয়ে থাকতে হয় না। জেল তো জেল, ফাঁসি হলেই বা দুঃখ কি? তিল তিল করে মরার চেয়ে পলকের মধ্যে সব সাবাড়— সে ভালো, খুব ভালো।

কিন্তু কাচ নয়, কনেষ্টবলও নয়, আরও রয়েছে। মাথার উপরে আছেন নারায়ণ, পাপ-পুণ্যের নিক্তি নিয়ে অতি-সতর্ক চোখে চেয়ে আছেন। ভয় তাঁকে, ভয় তাঁর রুক্ষ মার্জনাহীন দৃশ্যাতীত দৃষ্টির। যুগ যুগকাল কত চেষ্টা কত পুণ্য কাব্যকথার মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে ঈশ্বরের গৌরব। রাজারা দু-হাতে ঐশ্বর্য উজাড় করে কারুখচিত মন্দির গড়েছেন। এই যেমন আজ দুপুরে ভৈরব গিয়েছিল একটায়। খরচ করে ঠকেন নি ; মন্দিরবাসী দেবতা সতর্ক চোখে তাঁদের বিত্ত পাহারা দিচ্ছেন। আমার মুখে ভাত তুলে দেওয়া ঐ ঈশ্বরের কর্তব্য নয়,—তোমার বাড়তি ভাত আমি খেয়ে যদি বাঁচতে চাই, অনির্দেশ্য হুমকি এসে আমার হাত আড়ষ্ট করে দেবে। জয় হোক মহিমময় ঈশ্বরের! সার্থক ঈশ্বরভক্তেরা, যাঁরা খরচপত্র করে আকাশ-চুম্বী মন্দির গড়ে দিয়েছেন।

কে ও বেরুচ্ছে? বিপিন সরকার না? সে-ই। পিছনে ভারে ভারে দই-রাবড়ি ক্ষীর-সন্দেশ যাচ্ছে। আটজনে বাঁকে করে নিয়ে চলেছে, তারা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

দাঁড়ান ও সরকার মশাই, শুনুন একটা কথা। ছুটতে পারিনে—

বিপিন ভয় পেয়ে যায়, পঙ্গপালের মতো ক্ষুধার্তের দল—ঘিরে ফেলতে কতক্ষণ? সময় বড্ড খারাপ পড়েছে, কিছু বলা যায় না—সোনারূপা নিয়ে বেরুনো যায়, কিন্তু খাদ্য নিয়ে চলা দায় হয়েছে। ভালয় ভালয় ফটক পার করে জিনিসগুলো ঘরে তুলতে পারলে সে বেঁচে যায়। বিপিন গতিবেগ আরও বাড়িয়ে দিল। ভৈরব ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে, আস্তে চলুন সরকার মশাই, শুনুন না—

ভিতরে ঢুকে বিপিন সুস্থির হল। দরোয়ান রঘুনন্দন সিং ঘড়াং করে ফটক বন্ধ করে। লোহার গরাদে দেওয়া—ওদিকটা দেখা

যাচ্ছে। উপর থেকে মধুর সুরে রসুনচৌকি বেজে উঠল, চারিদিক ফুল পাতা আর রঙীন কাপড় দিয়ে সাজানো। সেই ফুটফুটে খুকী দিদিমণির বিয়ে তবে আজকে ?

ভৈরব ডাকে, চিনতে পারছেন না সরকার মশাই ? তাকিয়ে দেখুন তো। বাবুর সঙ্গে দেখা করব একটু—

যা-যা। বাবুর আর কাজকর্ম নেই কিনা—

বিপিন চলে যায়। ভৈরব আর্ত চিৎকার করে বলে, আমার যে নেমন্তন্ন এখানে ! আমি ভিতরে যাব।

মুখ ফিরিয়ে চেয়ে বিপিন হেসে উঠল। নেমন্তন্ন থাকে, বেশ তো—বাড়িতে মোটর যাবে। গাড়ি চড়ে চলে আসিস। এখন ক্ষমা দে, বাপু।

বন্দুক কাঁধে তুলে রঘুনন্দন সিং বেরিয়ে আসছে। বর আসবার সময় হয়ে এল, রাস্তা খালি করতে হবে। যারা ভিড় করেছিল, ছুটোছুটি করে পালিয়ে যায়। রঘুনন্দন ভিতরে গেলে দু-এক করে আবার এসে জোটে। বিকাল থেকে এই রকম চলছে।

বাঁ-দিক্‌কার গলি দিয়ে ভৈরব ঢুকে পড়ল। যেতে যেতে বাড়িটার পিছন অবধি গেল। দরজা খুঁজছে। গিন্নি নিজে তাকে নিমন্ত্রণ করেছেন—এরা ঢুকতে দিল না—কিন্তু একবার কোন গতিকে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারলে হয়। আঃ, কি দরদ—মা বলে সেই দয়াময়ীর পায়ের নিচে মাথা ঠেকাতে ইচ্ছে করে ! ···দরজা পাওয়া গেল, কিন্তু ভিতর থেকে বন্ধ। ভৈরব বড় রাস্তা অবধি চলে আসে, আবার যায়। দু-তিনটে দরজা—কোনটা খোলা নেই। অনন্ত অপরিমিত রত্নভাণ্ডার সে চাচ্ছে না, শুধু পেটের খোরাকি। আলিবাবার মতো একটা মন্ত্র কেউ বলে দিত, ঝন-ঝন করে খুলে যেত দরজা !

গন্ধ বেরুচ্ছে, পিছনের রান্নাবাড়িতে কত কি রান্না হচ্ছে! হয়তো ভাত ফুটছে টগবগ করে···কতদিন ভাত গলায় ওঠেনি, যুগযুগান্তর বলে মনে হচ্ছে। ভৈরব যেন পাগল হয়ে ওঠে। হঠাৎ এক নজর প্রভাবতীকে দেখতে পেল। কি কাজে বড় ব্যস্ত হয়ে তিনি পিছন-দিক্‌কার বারাণ্ডায় এসেছিলেন। ভৈরব প্রাণপণে ডাকে, মা ঠাকরুণ, মা, মাগো—

অত উঁচু অবধি ডাক পৌঁছয় না। প্রভাবতী যেমন এসেছিলেন, তেমনি চলে গেলেন। যেন মত্তহস্তীর বল এল বুড়ো ভৈরবের অস্থিসার দেহে। কাঠবিড়ালের মতো সে আঁচড়ে দেয়াল বেয়ে ওঠে। ঠাকরুণ রয়েছেন ঐখানে কোথাও। নিজের মুখে নিমন্ত্রণ করেছেন, আর কেউ না চিনুক তিনি ঠিক চিনবেন।

ঐ যে—দেখ দেখ, ঐ একটা!

এই মন্বন্তরের মাঝে চোর-ছ্যাঁচোড় ভিখারিরা কৌশলে ঢুকবার চেষ্টা করবে, আগে থেকে আন্দাজ করে চারিদিকে কড়া পাহারা মোতায়েন হয়েছে। ভৈরবের মাথা পাঁচিল ছাড়িয়ে উঠতেই ওদিক থেকে দিল এক লাঠির খোঁচা। আর্তনাদ করে সে মাটিতে পড়ল, উৎসব-বাড়ির আনন্দ-আয়োজনের মধ্যে সে শব্দ কারও কানে গেল না। রাস্তার উপর কণ্ট্রোলের দোকানের পাট এখন চুকে গেছে, ভিড় ছিল না, ক'জনে শুধু কয়লার দাগ কেটে নিজ নিজ জায়গা চিহ্নিত করছিল কাল সকালবেলাকার অনুষ্ঠানের জন্ম। তারা ছুটে এল। ওরই মধ্যে একজন ভৈরবকে চিনল, রজনী কয়াল তার নাম। কিছুদিন সে ভৈরবের নৌকায় দাঁড়ির কাজ করেছিল, তখন খুব ভালবাসাবাসিও হয়েছিল।

ধরাধরি করে ভৈরবকে কলের কাছে নিয়ে এল। ভিড় জমেছে।

পথ-চলাত মানুষ—নানা জনে নানা মন্তব্য করছে। অসৎ কর্মের ফল হাতে হাতে—পাঁচিল টপকে যেমন চুরি করতে গিয়েছিল! সাহসও বলিহারি মশায়, ঐ তো হাড় ক'খানা—সে উঠেছে অত উঁচুতে!...

রজনী যথাসাধ্য করছে, জল দিয়ে রক্ত ধুইয়ে দিল, মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। ভৈরব এক-একবার হাঁ করছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে উচ্চকণ্ঠে রজনী বলে, ও দাদা তেষ্টা পেয়েছে? জল খাবে?

অর্ধ-অচেতন ভৈরবের মুখ থেকে জড়িত স্বরে বেরিয়ে আসে, উঁহু—ভাত দে, চাট্টি ভাত—

রজনীর চোখে জল এসে যায়। নির্ভাস্ত সরল এই ভালোমানুষটি মরবার আগে একমুঠো ভাত খেতে চায়। কিন্তু এ যে কংসরাজার বন্ধ ফরমাস—চারিদিকে রাস্তার ধুলো জঞ্জাল, কোথায় পাবে ভাত? ভৈরব নিষ্প্রভ চোখ চেয়ে হাঁ করে আছে, সাগ্রহে ঠোঁট নাড়ছে... কি দেবে ঐ মুখে?

ভাত তো নেই, দাদা—

রাঁধছে?

মৃত্যুপথযাত্রীকে রজনী নিরাশ করতে চায় না। আর কতক্ষণই বা! হ্যাঁ—ফুটছে। এই হয়ে এল। ততক্ষণ জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নাও, লক্ষ্মী দাদা আমার—

ভাত ফুটছে! নূতন রূপশালি চালের ভাত, ভুরভুরে গন্ধ। নবান্ন হয় এই চালে। আর একটু সবুর করতে হবে—একটুখানি মাত্র। ভৈরবের মুখে অনন্ত আগ্রহের ছবি। হয়ে এল রান্না— ...ছোটবেলার মা যেমন তাকে বলত, ঘুমুস নি খোকা—হয়ে এল; উঠে বোস, ঘুমুস নি—

কিন্তু ঘুম বড় জড়িয়ে আসছে চোখের পাতায়। জাগ্রত হয়ে থাকতে সে চেষ্টা করছে—কিন্তু চেতনা স্তিমিত হয়ে আসে, সব যেন ধোঁয়া হয়ে তালগোল পাকিয়ে যায়। রজনী কান্নাজড়িত কণ্ঠে তার কানে কানে বলে, গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম। ও দাদা, ঠাকুরের নাম কর। এ জন্মে যা হবার হল—পরজন্মটা বরবাদ না হয়।

চিরদিনের ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ!—ছেলে ডুবেছে, তা-ও মনে করে ঠাকুরের কোলে আছে। সে আজ চরমক্ষণে গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম বলছে না, ঈশ্বরের উপর কৃতজ্ঞতার কোন কারণ নেই। সেই ন-বছর বয়স থেকে শীত নেই, বর্ষা নেই—চিরকাল সে খেটে এসেছে, কোনদিন অবহেলা করেনি, জীবনে একটা পয়সা অপব্যয় করেনি, কোন অন্যায় বা পাপ করেনি—তবু সে খেতে পরতে পেল না। ধরিত্রীর সব ধান-চাল টাকা পয়সা কাপড়-চোপড় চল্লিশ-ডাকাতে গুপ্ত-ভাণ্ডারে নিয়ে রাখল, বন্ধ-দরজায় সে ঘুরে মরেছে, কিছুতে দোর খুলল না। মৃত্যুক্ষণে ভৈরবের ঠোঁট নড়ছে—ঠাকুরের নামগান করবার জন্য নয়—ভাতের আশায়, ভাত দে......ভাত......ভাত......

পরদিন সকালে দিনক্ষণ খুব ভালো, বর-কনে বিদায় হবে। সানাই বাজছে। শুভকর্মে চোখের জল ফেলতে নেই, থমথমে মুখে হিরণ ঘোরাফেরা করছেন। কাল রাতে বাড়িময় গণ্ডগোলের মধ্যে তাঁর খাওয়া হয়নি; অমিতা যাবার আগে বাবাকে জোর করে খেতে বসাল। হিরণ বলেন, তুই বোস খুকী, নইলে আমি গালে তুলছিনে। আসন টেনে নিয়ে অমিতাকেও বসতে হয়। বাপ নিজে খাচ্ছেন, আর কচি খুকিটির মতো অমিতার গালে তুলে দিচ্ছেন। আর বাধা মানে না, চোখের জলের ধারা বইল। সানাই করুণ-

রাগিণীতে আলাপ করছে, প্রাণের ভিতর আলোড়িত হয়ে ওঠে।

ফুলে ফুলে সাজানো মোটর-গাড়ি—যেন বিজ্ঞানযুগের ইস্পাতের যান নয়, কল্পলোকের বিচিত্র একটি ময়ূর। দেশটাও যেন কল্পলোকের। ফুল আর খই ছড়াচ্ছে উপর থেকে। ফুটফুটে ছেলেমেয়ের দল, সুশ্রী সুগৌর-তনু কত তরুণী—দামি কাপড়-চোপড় পরা, দামি দামি গহনা ঝিকমিক করছে, মুখে মুখে হাসি—হাসির তরঙ্গ উৎসারিত হয়ে এদিক সেদিকে পড়ছে, উগ্রমধুর সেন্টের গন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাস... অপরিমিত ঐশ্বর্য। এই অপূর্ব মনোহর মানুষগুলিও যেন মাটির পৃথিবীর নয়—রূপকথায় যে রাজপুত্র-রাজকন্যাদের কথা শুনে থাকি তারাই। লনের দক্ষিণদিকটায় ত্রিপল-ঢাকা অস্থায়ী সেডটার নিচে গত রাত্রের বাড়তি ঝুড়ি ঝুড়ি সন্দেশ পোলাও ফ্রাই লুচি। এর একটা বিলিব্যবস্থা করতে হবে, বিপিন সরকার ভয়ানক ব্যস্ত।

এ যেন দ্বীপের মতো, বাইরের থেকে বিচ্ছিন্ন, একেবারে স্বতন্ত্র। এই নরনারীরা কাঁদতে শেখেনি, হাহাকার জানে না, বিশ্রী নিরলঙ্কার ভাবে অভাব-অনটনের কথা বলতে পারে না, কেবল সুমিষ্ট হাসি, শালীন হিউমার, উঁচুধরণের কথাবার্তা। অগণ্য মানুষের জীবন-সংঘর্ষে লোনা ঢেউ চারিদিকে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে—মাঝখানে এরা নারিকেল-মর্মরিত শান্ত সুস্নিগ্ধ মায়াকুঞ্জ রচনা করেছে।

গেট থেকে বেরিয়েই ব্রেক কষে মোটর থামাতে হয়। রাস্তায় পড়বার মুখে আড়াআড়ি খানিকটা জায়গা জুড়ে শুয়ে আছে মানুষটা। ড্রাইভার চেঁচিয়ে ওঠে, এই উল্লুক! সত্যি, কি রকম বেকুব—এ কি একটা শোবার জায়গা? চাপা পড়লে তখন তো ড্রাইভারকে নিয়েই টানাটানি!

হঠ যাও। এই বুড়বাক—

এত চিৎকার চেঁচামেচি, তবু ওঠে না। রাগে গরগর করতে করতে ড্রাইভার নেমে জুতা সুদ্ধ পায়ের লাথি উঠিয়েছে···পা'টা নামিয়ে নিল। ঘুম নয়, মরে গেছে বেটা। মুশকিল! জন দুই ভিতর থেকে ছুটে এসে মড়াটা ড্রেনের দিকে গড়িয়ে দিল। রওনা হবার মুখে কি অলক্ষণ! কালকের ভোজে ময়দা লেগেছিল, খালি বস্তাগুলো পড়ে আছে—তার গোটা দুই এনে ঢেকে দিল, যাবার সময় মড়া দেখতে না হয়। মুখটা চেনা নাকি? যেন ভৈরবের মতো। না-ও হতে পারে। ক্ষুধা-বিশীর্ণ বীভৎস ওদের সব মুখের চেহারা মোটামুটি এক—তোমার আমার মুখ নয় যে আলাদা করে চেনা যাবে।

কিন্তু ক'টিকে ঢাকা চলে ময়দার বস্তায়? শুয়ে আছে, বসে আছে—আরও কত! বসে থেকে ক্ষুধা-লোলুপ চোখে যারা তাকাচ্ছে তারা আরও ভয়ানক; মড়া জ্যান্ত হয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকালে যে রকমটা হয় তেমনি। অমিতা শিউরে তাড়াতাড়ি মোটরের কাচ তুলে দেয়; রাস্তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে বরের দিকে তাকায়। বরও তাকিয়ে আছে পরম রূপসী নববধূর দিকে। ব্যস—আর তো কেউ নেই, মাত্র এরা দু'টি। দু-জনের মুখে মধুর হাসি ফুটে উঠল। চালাও জোরে···জোরে···আরও জোরে। তীব্র হর্ন দাও, রাস্তা ছেড়ে ওরা সব ছুটে পালাক। গাড়ি এখনই গিয়ে দাঁড়াবে আর এক প্রকাণ্ড গেটের ভিতরে মার্বেল-বাঁধানো প্রকাণ্ড সিঁড়ির পাশটিতে। ততক্ষণ এ-ওর দিকে চোখ চেয়ে ঠেঁশাঠেঁশি হয়ে বসে থাকো তোমরা। এক দ্বীপ থেকে আর এক নিরাপদ দ্বীপে যাচ্ছে, মাঝের লবণাক্ত সমুদ্রটুকু চোখকান বুঁজে কোন রকমে কাটিয়ে দিতে পারলে হয়।

বন্যা

গেল বৈশাখে শ্রীপতি প্রথম এ জায়গায় আসে। নিবারণ তাকে দু-দুখানা জরুরি চিঠি দিয়েছিল, বিশেষ করে আঠাশে তারিখটায় আসবার জন্য। কেন—কি বৃত্তান্ত সে সব খুলে লেখেনি। অনেক কন্দিফিকিরে দুটো দিনের ছুটি করে শ্রীপতি আঠাশে বিকালের গাড়িতে এসে পৌছল। গলার আওয়াজ পেয়ে নিবারণ ওঠে কি পড়ে—ছুটে যায় পাঁচিলের দরজা অবধি; হাত ধরে তাকে নিজের খোপটির ভিতর জামকাঠের তক্তাপোষে এনে বসায়। আর যে কি করবে, খানিকক্ষণ ঠিকই করতে পারে না। ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়ে দেয়, যা পান নিয়ে আয়, আর বিড়ি···ছুটে যা। বাচ্চা মেয়েটার বয়স আড়াই বছর; তক্তাপোষের কোণে ঘুমিয়ে ছিল। শ্রীপতির অসুবিধা হচ্ছে বিবেচনা করে তাকে মেজের উপর মাটিতে নামিয়ে রাখল।

শ্রীপতি তাড়া দিয়ে ওঠে, কি হচ্ছে এসব? আমি কি নবাব-বাদশা এলাম তোমার এখানে?

নিবারণ এক ফাঁকে বেরিয়ে লম্বা লাইনটা আগাগোড়া পাক দিয়ে এল। তারপর লোকের পর লোক—বেশির ভাগই গলিতে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে চলে যাচ্ছে। দু-চারজন বারান্দায় ওঠে। যতীন, রাখহরি, আর চরণ ঘোষ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। নিবারণ জাঁক করে বলছে, এই···এই—আমার পরিবারকে দেখেছিলে তো? তার সঙ্গে মুখের আদল কি রকম মিলে যাচ্ছে, দেখ। সম্পর্কে তার মাসতুত ভাই কি না!

কুটুম্বর গৌরবে নিবারণ যেন ফেটে পড়ে। লোকের মতো লোক একটা—সকলের মধ্যে খাতির বেড়ে যায় এই রকম দু-একজন

কুটুম্ব থাকলে। বলে, এই রোগা-পটকা মানুষ—কিন্তু সাহেবের সঙ্গে প্যাঁচ কষে আগাগোড়া সকলের পনের টাকা করে ভাতা আদায় করেছে। যে সে সাহেব নয়, খাঁটি সাদা সাহেব, জাত গোখরো—তার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো—তা হলে বোঝ ব্যাপারটা।

শেষকালে অসহ্য হয়ে উঠল। রাগ করে শ্রীপতি বলে, আর একটা লোক নিয়ে এসেছ কি, এক্ষুনি আমি হাঁটা দেব—

নিবারণের ইচ্ছে ছিল, দু-নম্বর লাইনটাতেও খবর দিয়ে আসবে। কিন্তু এর পর ভরসায় কুলায় না। ক্ষুন্ন হয়ে চুপচাপ সে দাঁড়িয়ে রইল।

শ্রীপতি বলে, মানুষ ডেকে ডেকে সং দেখাবে বলে কি এত খবরাখবর করে নিয়ে এলে ?

নিবারণ বলে, সবুর কর ভায়া, সবুর কর। কেন এনেছি দেখো—তোমার গাড়িভাড়ার বিশগুণ উশুল হয়ে যাবে।

ঘরের মধ্যে বড্ড গুমট, শ্রীপতি বারান্দায় এসে আড়ামোড়া ভাঙে। নিচে লম্বা গলি। ভাতের ফেন, আনাজের খোসা, পোড়া বিড়ি, ছেঁড়া শালপাতার ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে বিস্তর মেয়ে-পুরুষ আনাগোনা করছে। সামনে টালি-ছাওয়া টানা লম্বা ঘর—খোপে খোপে ভাগ করা। সেখানে এদের রান্না হয়। আর এদিককার এক একটা খোপে এক এক পরিবারের শোওয়া-বসা সমস্ত চলে।

সন্ধ্যার পর নিবারণ শশব্যস্তে বলল, পিরান চাপাও। টেরি কেটে নাও শিগগির। সবাই রেডি।

ব্যাপার কি ?

কর্তামশায়ের ছেলের বিয়ে হয়েছে। পাকস্পর্শের ভোজ—জবর খাওয়াবে।

শ্রীপতি বলে, আমি তো যাব না। নেমন্তন্ন তোমাদের। আমি যাব কেন ?

তোমারও। একগাল হেসে নিবারণ ছাপানো নিমন্ত্রণ-পত্র দেখায়। বলে, দলিল রয়েছে ভায়া, এমনি নয়। সবান্ধবে যেতে বলেছে, এই দেখ। যাকে খুশি নেব—কে রুখবে ?...আর তুমি তো সত্যিকার কুটুম্ব, একেবারে আপনার লোক—

আবার গলা নামিয়ে বলে, শোন তাহলে। ঘি-চাল-তেল যায় রঁাধুনে বামুন অবধি কলকাতা থেকে এনেছে। সাহেব-সুবো খাবে বলে টিনে ভরতি বিলাতি শুঁটকি মাছ। মহীতোষ রাহার আয়োজন হেঁ হেঁ—খুঁৎ ধরবার উপায় নেই।

মহীতোষ রাইস-মিলের নাম শোনেননি আপনারা ? আর আর ধান-কলে রোদে ধান শুকোয়, ষ্টিমে সিদ্ধ-ভানাই হয়—এখানে ডায়নামো বসিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হয়ে থাকে, সব কাজকর্ম বিদ্যুতে চলে। অন্ধকার-নিমগ্ন মাঠ-ঘাট গ্রামপুঞ্জের মাঝখানে মহীতোষের বাড়ি ও রাইস-মিল বিদ্যুতালোকে ঝলমল করে। সাধারণ একটা গ্রামের মধ্যে এ রকম ব্যবস্থা—রাত্রিবেলা ট্রেনে যেতে যেতে দেখে অবাক হতে হয়। মহীতোষের ছেলে প্রেমতোষ বাঙ্গালোর থেকে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ডিগ্রি নিয়েও কোন চাকরি-বাকরি করল না, বাপের ব্যবসা দেখছে। এসমস্ত তারই কীর্তি। ব্যবসায়ে সে যুগান্তর আনবে, সবাই বলাবলি করে।

মিলের সাড়ে পাঁচ শো লোক—মজুর-গাড়োয়ান থেকে ম্যানেজার অবধি—যথাসম্ভব সাফ-সাফাই হয়ে নিমন্ত্রণে চলেছে। বুড়ো কৈলাস হাজরা এই আজ সকালেও বমি করতে করতে মাথা ঘুরে পড়েছিলেন—

জ্বরটা কি গেছে হাজরা মশায় ?

কি করি বাপু। বুড়ো কর্তা হয়তো গেটে দাঁড়িয়ে। গলায় মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে যাচ্ছি। যা থাকে কপালে, খেয়ে তো আসি। কাল থেকে আবার আচ্ছা করে কুইনিন গিলব।

ভাল খাওয়া হবে, সে লোভ আছে—তার উপর মনিব চটে না যান, মনে মনে সেই আতঙ্ক। যত লোক এখানে কাজ করে, সকলের নাম ধাম পরিচয় মহীতোষের কণ্ঠস্থ; তার জন্য খাতাপত্র হাতড়াতে হয় না। বুড়োর চোখে ধুলো দেওয়া যায় না, কে এল আর কে এল না—সমস্ত মনে মনে গাঁথা হয়ে থাকবে।

বাঁচোয়া, মহীতোষ ফটকে নেই—তাঁর নাকি হাঁপানি বেড়েছে। দাঁড়িয়ে আছে বিল-সরকার বনমালী গুপ্ত। দাঁত খিঁচিয়ে সে বলে উঠল, সরে যা—সরে যা। ইদিকে কেন তোরা ?

উর্দি-চাপরাস-পরা দরোয়ান এগিয়ে পথ আটকে দাঁড়ায়। নিবারণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, এমনি আসিনি মশাই। নেমন্তন্ন হয়েছে জানেন ?

জানি, খুব জানি। অবহেলার সঙ্গে এদের পিছন করে ক'জন বিশিষ্ট আগন্তুককে বনমালী পথ দেখিয়ে দিল। তারপর বুঝিয়ে বলে, তোদের হল লাল চিঠি—উ-ই যে রাঙা শালুর উপর তিন নম্বর বলে লেখা রয়েছে, ঐ ফটক দিয়ে ঢুকবি তোরা। সাদা খামে সোনালি চিঠি নিয়ে আসছেন যাঁরা তাঁরাই শুধু এদিকে।

শুধু ফটকই নয়, ভিতরের ব্যবস্থাও আলাদা। প্রশস্ত লন, কাঠ ও বাঁশ দিয়ে মাঝখানে ঘেরা। ওদিকে সোনালি চিঠিওয়ালাদের জন্য টেবিল-চেয়ারের বন্দোবস্ত, এদের এদিকে কুশাসন ও কলাপাতা।

শ্রীপতি বলে, আমি ফিরে চললাম। এ খাওয়া মুখে রুচবে না। এদের যখন চাকরি করি না—আমার ভয়টা কি?

নিবারণ বোঝাতে লাগে, মাথা গরম কোরো না ভায়া। ঐ রকম উবু হয়ে আমরা কি খেতে পারতাম? এঁটো-কাটার বিচার নেই, ম্লেচ্ছর মতন গবাগব গিলছে, দেখ। বেশ করেছে, হাতের আঙুল আর পায়ের আঙুল কি সমান হয়? যার যেখানে জায়গা...চটলে চলবে কেন?

আবার ভয় ধরিয়ে দেয়, ফিরে গেলে স্রেফ পেটে কিল খেয়ে পড়ে থাকতে হবে, বুঝলে? লাইনের কারও উনানে আগুন জ্বলেনি। ঘরে এক টুকরো বাতাসাও নেই। তার চেয়ে বলি কি—ভাল ভাল জিনিসপত্তোর, চক্ষু বুজে পেট-ভর্তি করে নাও। এমনি করে ঠাসবে যাতে মুখ নামানো না যায়, নামালে বেরিয়ে আসে। খাতির কিসের? ফিরবার সময় আমরা আকাশমুখো মুখ তুলে চলে যাব।

বিবেচনা করে শ্রীপতিও শেষে সায় দিল—না, খাতির নেই। চালাও প্রাণপণে।

লুচি ছেঁড়াই মুশকিল। দুপুরের দিকে ভেজে রাখা, টানলে রবারের মতো লম্বা হয়।

পাঁচু বলছে, দু-মনি ধানের বস্তা নিয়ে চালতে পারি কলের মু..., আর লুচি ছিঁড়বে না? ওর চোদ্দপুরুষ ছিঁড়বে। টানো—দু'হাতে না পেরে ওঠ, হাতে-পায়ে ধরে টানো দিকি—

এদিকে-ওদিকে চেয়ে উৎসুককণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করে, পোলাও নিয়ে আসে কই নিবারণ-দা?

আনবে, আনবে। লুচির পাট হয়ে গেলে তবে তো? মুখ একটা মাত্র। তাড়া কিসের?

একজন তদারক করে বেড়াচ্ছিল। বলল, পাতা হাতে করে ওঠ বাছারা। এঁটো-পাতা রেখে যেও না। বড়-রাস্তার নর্দামায় ফেলতে হবে—

বলে কি, এরই মধ্যে উঠবার প্রসঙ্গ! পাঁচুর চোখে জল আসবার মতো। পোলাও-র জন্য জায়গা রেখে সে মোটে আধপেটা খেয়েছে। বেড়ার ওদিকে সোনালি চিঠি-ওয়ালাদের হরদম দেওয়া হচ্ছে—খেতে পারছে না ফেলে দিচ্ছে, তবু জোর করে পাতে চাপাচ্ছে—তার উগ্র সুমিষ্ট গন্ধে বাতাস ভরে গেছে। শুধু কি ঐ গন্ধেই শোধ যাবে? নিবারণের গা ঠেলে পাঁচু বলে, কি বলছে শোন, ও দাদা। শেষটা কি জল দিয়ে পেট ভরাব? নিদেন-পক্ষে হাতাখানেক করে দিক না ইদিকে। তুমি একবার ডেকে বল।

নূতন বউ সুপ্রীতি আছে বৈঠকখানার পাশের ঘরটিতে। আরও অনেকগুলা কমবয়সি মেয়ে সেখানে। লনের এধার ওধার সব দিক দিয়েই বউ দেখা চলে। এমনই সুশ্রী সুন্দর নিটোল চেহারা—তার উপর ফুল দিয়ে তাকে অপরূপ করে সাজিয়েছে, পটে-আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছে। অতিকায় উঁচু একটা চেয়ারের উপর বউয়ের বসবার জায়গা। খানিকটা দূরে টেবিলের উপর নানারকম উপহার স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে, রাজরাজেশ্বরীর সিংহাসনের সামনে ভক্তেরা নানারকম অর্ঘ্য দিয়ে যাচ্ছে, এই রকম একটা ভাব। একটা-কিছু এলে মেয়েরা তাড়াতাড়ি খুলে দেখছে, খানিকক্ষণ হাতে হাতে ঘোরে, সকলে তারিপ করে, তার-পর নম্বর এঁটে উপহারদাতার নাম সমেত খাতায় জমা করে টেবিলের উপর রাখা হয়। কত কি জিনিস—জড়োয়া গয়না থেকে চিত্র-বিচিত্র ছবির বই। মিলের বাবুরা একসঙ্গেই এসেছে, অথচ উপহারের জিনিস কেউ কাউকে দেখাচ্ছে না—এ ওর উপর

টেক্কা দিয়ে কর্তাদের সুনজর আদায় করবে, এই মতলব। সুপ্রীতি ভারি চঞ্চলা মেয়ে, একটাবারও বসছে না, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রেমতোষ বন্ধুবান্ধব সঙ্গে করে ঢুকছে, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে হেসে হেসে আলাপ করছে সুপ্রীতি। বউয়ের অহঙ্কারে প্রেমতোষের যেন মাটিতে পা পড়ছে না। এমন সুন্দরী বউ—অহঙ্কারের কথাই বটে!

এরা দেখছে আর দেখছে। আপনিই একটা তুলনার ভাব এসে পড়ে শ্রীপতির মনে। তারও বিয়ে হয়েছে বেশি দিন নয়, এখনো দু-বছর পোরেনি। বউয়ের নাম চারু। কালো, রোগা—কিন্তু হাসিটা বড় মিষ্টি। ঐ যে সুপ্রীতি হাসছে, ওর চেয়েও তার হাসি ভালো। চারু তাকে চিঠি লেখে, তার মধ্যে ঝুড়ি ঝুড়ি পদ্য। দেখা হলে কালো মেয়েটা কথার তুবড়ি ছুটায়। কিন্তু শ্রীপতি কারো সঙ্গে চারুর পরিচয় করিয়ে দেয় না, বউয়ের রূপহীনতার দরুণ মনে মনে লোকে অবজ্ঞা করবে এই আশঙ্কায়। সুপ্রীতির মতো অত ফর্শা রং অবশ্য আশা করা যায় না, কিন্তু চারু যদি ফ্যাকাশেও হত একটু! আজ এখানে এসে অবধি এর তার মুখে প্রেমতোষের শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে অনেক খবর সে শুনেছে। কলকাতা শহরে খান পঞ্চাশ বাড়ির মালিক, মফস্বলেও তাঁদের জমিদারি আছে, রীতিমতো বনেদি ঘর, ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল থেকে কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে দহরম-মহরম, বাড়ির ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত এক একখানা মোটরগাড়ি। তবে হবে না কেন এত ফর্শা? চার-পাঁচ পুরুষ ধরে মাটির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলছে…ময়লা লাগে না, তেতলা চারতলায় আরামে থাকে, ভাল খায়, ভাল পরে—নেহাৎ বেড়াবার শখ হলে পিচের রাস্তায় বিশাল মোটরের গর্ভে ঢুকে পড়ে। মোটর ছোটে, তাতেই বেড়ানো

হয়ে যায় ওদের। জীবনে এক কণিকা ধুলো লাগেনি গায়ে,—এমন ধবধবে রঙ খোলে কি সহজে?

অন্ধকার পথে তারা ফিরে চলেছে। এতক্ষণ উগ্র বিদ্যুতের আলোয় থেকে পথটা দুর্নিরীক্ষ বোধ হচ্ছে। ডায়নামো বসিয়ে তৈরি-করা বিদ্যুৎ—সে এদের জন্য নয়। আর সকলে তবু হামেশা গতায়াত করে, তাদের চেনা পথ। শ্রীপতি ইটে হোঁচট খেয়ে উ-হু-হু করতে করতে অনেক কষ্টে নিবারণের খোপে গিয়ে উঠল।

তক্তাপোষে মাদুর বিছিয়ে নিবারণ বলে, শুয়ে পড়, রাত হয়েছে।

তুমি?

সে হয়ে যাবে। শুয়ে পড় দিকি। কত জায়গা রয়েছে।

গলিতে না গাবতলায়? মেজের তো ছেলে-মেয়ে শুয়ে পড়েছে, আর ঢেলে রেখেছ যত আনাজ-পত্তোর—

তাচ্ছিল্যের সুরে নিবারণ বলে, ঐ অত বড় একটা বারান্দা আছে কি করতে? আর হয়ই যদি গাবতলা। জায়গাটা কি মন্দ?

একটা মাদুর হাতে করে সে বাইরের দিকে যায়।

শ্রীপতি বলে, বালিশ লাগবে না?

ওরে বাসরে! মাথার নিচে থেকে বেমালুম সরিয়ে নেবে, তারপর খোল ছিঁড়ে ফেলে দু'আনায় তুলো বেচে দিয়ে আসবে। বড্ড যাচ্ছেতাই জায়গা। ঐ যে আমার ভাই-ব্রাদার সব—কত ভালো ভালো কথা বলে গেল তো তোমার সঙ্গে—সব শালা চোর। বালিশ তো বালিশই সই। বাচ-বিচার করে না।

ক'টা বালিশ বাড়তি আছে তোমার? কই দেখি—

এসব বাজে কথায় নিবারণ কান দেয় না। শ্রীপতি বলে, তোমার ঘরে তুমিই থাক দাদা। আমি পেরে উঠব না। আমি বেরুলাম।

রুষ্টকণ্ঠে নিবারণ বলে, ঘরের দোষটা হল কি শুনি?

কোথায় ঘর? অন্ধকূপ। কড়িকাঠের ধারে ঘুলঘুলি দিয়ে রেখেছে, বাইরের হাওয়া গায়ে লাগতে দেবে না। গোরুর গোয়ালেও লোকে আজকাল দুটো-একটা ফুটো রেখে দেয়।

এত খাতির করে পাতা তক্তাপোষের মাদুরে শ্রীপতিকে কিছুতে শোয়ানো গেল না, সে বারান্দায় গেল। সেখানেও টিকতে পারে না; উঁচু পাঁচিল আর রান্নাঘরের সারি জায়গাটাকে যেন কয়েদখানা করে রেখেছে। অনেক রাত্রে পাঁচিলের দুয়োর খুলে সে বাইরে এসে দাঁড়ায়। তখন চাঁদ উঠেছে। পৃথিবীতে বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, গাছের পাতাটাও নড়ে না। একটু এগিয়েই মাটির প্রশস্ত উঁচু বাঁধ। বাঁধের ওদিকে কয়েকখানা ক্ষেত—সরু রাস্তা গিয়েছে ক্ষেতের ধার দিয়ে। আর খানিক গিয়ে শ্রীপতি দামোদরের গর্ভে পৌঁছল। বাধাবন্ধহীন ফাঁকা আকাশ—সে নিশ্বাস ফেলে বাঁচল এতক্ষণে।

সীমাহীন বালুরাশি। সামনে অনেক দূরে জ্যোৎস্নালোকে ওপারের তীরভূমি কালো রেখার মতো দেখাচ্ছে। চলেছে তো চলেছে; জলের চিহ্ন দেখা যায় না। শেষকালে একটুখানি পাওয়া গেল, হাত দেড়েক গভীর, অতি সামান্য চওড়া। জলটুকু শ্রীপতি পার হয়ে গেল।

কারা এখানে? কি কর?

বাঁকড়ো জেলার মুনিষ আমরা মশায়। কাটোয়ায় যাচ্ছি। শুয়ে পড়েছি।

শ্রীপতিও তাদের মধ্যে আরাম করে বালুশয্যায় শুল।

খুব ভোরবেলা। লোকগুলো রওনা হয়ে গেছে, শ্রীপতিই কেবল ঘুমুচ্ছে একা-একা। খোঁজে খোঁজে নিবারণ এসে পড়ে।

হুঁ, জায়গাটা বেছেছ ভালো!

শ্রীপতি সায় দিয়ে বলে, তোফা, তোফা! চোদ্দপুরুষে কোনদিন এমন নরম বিছানায় শুইনি।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রভাতের আলোয় চারিদিকে চেয়ে দেখল। ইনি নাকি আবার বাঁধ ভাঙতেন, ঘর ভাসাতেন? এত নাম-ডাক এই দামোদরের?

নিবারণ বলে, ভাসাতেন বলছ কেন, এখনো কি পারেন না? মা-কালী রক্ষে করুন, সেদিন আর এসে কাজ নেই—

দূর-বিসর্পিত কঠিন বাঁধের দিকে চেয়ে শ্রীপতি হেসে খুন। ঐ বাঁধ ভাঙবে বালির মধ্যে মুখ-ঢাকা ক্লান্ত শ্লথগতি এই বিশীর্ণ জলধারা? হা-হা-হা! একটা ঘাস ছিঁড়বার মুরোদ নেই, নদী বললে এঁর নাকি আবার অপমান হয়—ইনি হচ্ছেন নদ!

নিবারণ বলে, তেমন ঢল যদি নামে, ঐ বাঁধ এক লহমায় উড়ে যাবে, চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। যাই বল ভায়া, এরকম জায়গায় পড়ে থাকা তোমার উচিত হয়নি। সর্বনেশে দামোদর! কখন কি করে বসে, আমরা মোটে বিশ্বাস করিনে।

এরই তিনমাস পরে আবার ডাক পড়েছে শ্রীপতির। ১৩৫০ সাল, স্মরণীয় বৎসর, ১১৭৬ সালের চেয়ে ইতিহাসে অনেক বড় জায়গা হবে এর জন্য। এবেরের চিঠিটা একটু বিস্তারিত; নিবারণ লিখেছে, বড় [illegible] - [illegible] এস।

ব্যাপার হচ্ছে, মহীতোষ রাহা মারা গেছেন; প্রেমতোষ সর্বময় কর্তা। চাল-সরবরাহের খুব বড় একটা কণ্ট্রাক্ট বাগিয়েছে সে।

মিল্লের লোকেরা বরাবর এক মন করে খোরাকি চাল পেয়ে আসছে মাসে মাসে। প্রেমতোষ বলে, যখন এই নিয়ম করা হয়েছিল চালের মন তখন চার টাকা। সেই হিসাবে এক মন কেন—আড়াই মনের দাম নগদ দশ টাকা পর্যন্ত ধরে দিতে সে রাজি আছে। কিন্তু চালের একটা কণিকা অপচয় করতে পারবে না।

খুব কান্নাকাটি করেছে এরা।

আমরা খাব কি, হুজুর? বাজারে চাল পাওয়া যায় না, টাকা দিলেও যে মেলে না।

প্রেমতোষের সাফ জবাব। টাকা—টাকা খেয়ে যারা থাকতে পারে, তারাই থাকবে। না পোষায়, সোজা ঐ পথ দেখা যাচ্ছে।

এরই মধ্যে প্রেমতোষ খুব চিনে ফেলেছে এদের। কুত্তার দল—জুতো মারো, ঠ্যাং খোঁড়া করে দাও, যতক্ষণ উচ্ছিষ্টের গন্ধ বেরুচ্ছে কেউ নড়বে না—মুখে যতই ঘেউ-ঘেউ করুক। যাবে কোথায়? দু-বেলা দু-মুঠো ভাত—সে তো দস্তুরমতো বিলাস-দ্রব্য হয়ে উঠেছে আজকাল। বাজারে ভেজালহীন খাঁটি চাল একদম পাওয়া যায় না—এ রকম জিনিস উঠেছে, তার নাম চালে-ডালে, টাকায় বারো ছটাক পর্যন্ত মেলে। চাল ও ডাল তাতে আধাআধি দেবার কথা, কিন্তু জোচ্চুরি করে তিনভাগই ডাল মিশিয়ে দেয়। বিপদে পড়ে তখন এরা শ্রীপতিকে খবর দিল। সাদা সাহেবকে যে কাবু করেছে, বাঙালি সাহেবকে কি করতে পারে, দেখা যাক। ষ্টেশনেই জন-পঁচিশেক প্রতীক্ষা করছিল। যখন শ্রীপতি নিবারণের ঘরে গিয়ে উঠল, যেন তারে তারে খবর হয়ে গেল। ফিসফাস কথাবার্তা…নিঃশব্দে সকলে গতায়াত করছে। পাঁচিলের দরজায় খিল এঁটে দেওয়া হয়েছে, জন-দুই সেখানে পাহারায় আছে।

এক ছোকরা বলে, ষ্ট্রাইক করা হবে নাকি? ওদের যা ব্যবহার, চুপ করে থাকা তো যায় না।

শ্রীপতি চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করে, কে ওটি?

সুরথ ওর নাম। অল্পদিন এসেছে। চালাক ছেলে, আর ভীষণ তেজি।

সুরথ বলতে লাগল, ষ্ট্রাইক করবেন কিনা তাই বলুন। কবে থেকে? কাল না পরশু? কাগজপত্র ছাপিয়ে এনে থাকেন তো দিন আমাকে; আমি বিলি করে আসছি। আর কি কি করতে হবে বলে দিন—

শ্রীপতি বলে, তোমরা যাও এখান থেকে। সকলে চলে যাও। শুধু যতীন আর চরণ ঘোষ—এই থাকলে হবে।

সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে, এখনও থমথম করছে আকাশ। বেঙ ডাকছে। শ্রীপতি নিবারণের ঘরে ঘুমিয়ে আছে, বাইরে শোবার উপায় তো নেই। অনেক রাত্রে দরজায় দমাদম লাথি—ভেঙে পড়ে আর কি! নিবারণ খিল খুলে দেখে, হাফপ্যাণ্ট-পরা মিলের সাব-ম্যানেজার নীলরতন দরোয়ান ড্রাইভার প্রভৃতিতে একটা পল্টন জুটিয়ে এনেছে। শ্রীপতিকে দেখিয়ে বলে, এ বেটা কোত্থেকে এসে জুটল? বল্—বল্—

মত্ত অবস্থা, মুখ দিয়ে ভকভক করে গন্ধ বেরুচ্ছে। উত্তরের অপেক্ষা না করে বলতে থাকে, যত জায়গায় লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াস তুই হারামজাদা। জুটেছিস এসে এখানে?

শ্রীপতি বলে, গায়ে হাত দেবেন না বলছি—

না, গায়ে হাত দেব কেন? শালা আমার গুরুঠাকুর এসেছেন, পায়ে হাত দিয়ে পূজো করব।

হাতের রুল দিয়ে মারল শ্রীপতির মাথায় এক বাড়ি। দরদর করে রক্ত পড়ে। নিবারণের জিনিষপত্র সমস্ত তারা ছুঁড়ে বাইরে ফেলল। বলে, সাহেব তোকে ডিশমিশ করেছেন। এক্ষুণি ঘর ছেড়ে বেরো। বেরো—বেরো—

নিবারণের ছেলেমেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল।

গলিতে নেমে নিবারণ ছড়ানো জিনিষপত্র কুড়ায়। দেখা গেল, যতীন আর চরণ ঘোষেরও ঐ দশা; তাদেরও চাকরি গেছে। নীলরতন হুমকি দিয়ে বারান্দায় ছুটোছুটি করতে লাগল। আর কে আছিস? কার কার পাখনা গজিয়েছে? সাহেব অবিচার করছেন, কে কে বলে বেড়াচ্ছিস—এগিয়ে আয় দেখি।

সকলে সকাতরে ঘাড় নাড়ে। না হুজুর, আমরা নই। আমরা অমন কথা বলতে যাব কেন? কোন গণ্ডগোলে আমরা থাকিনে।

ত্রিশটি পরিবার থাকে এক লাইনে। এই তোলপাড়ের মধ্যে কারও জাগতে বাকি নেই। কেউ একটা কথা বলল না, আতঙ্কে বোধ করি কারও নিশ্বাসও পড়ছে না। বর্ষারাত্রির পিছল পথে সামান্ত কাপড়-চোপড় ঘটি-বাটি বোঁচকা বেঁধে নিয়ে এরা বিদায় হয়ে গেল। রক্ত গড়িয়ে পড়ে শ্রীপতির কামিজটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, একটা বার মুছে ফেলবে—সে হুঁশও তার নেই।

পাঁচিলের কাছে দাঁত বের করে হাসছিল সুরথ। এদের দেখে সরে পড়ল।

কোথায় যায় এখন? বৃষ্টিটা থেমে আছে, কিন্তু ভয়ানক পিছল অন্ধকার পথ। সবচেয়ে মুশকিল বাধিয়েছে নিবারণের ছেলেমেয়ে দুটো। অবোধ, মা-হারা—রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে ভূতের ভয়ে চোখ খোলে না। কোথায় নিয়ে যাবে এদের? ওদিকে

নীলরতনের চিৎকার শোনা যাচ্ছে, সকালে কাউকে যদি ত্রিসীমানায় দেখি, গলা কেটে মাটিতে পুতে ফেলব। থানা-পুলিশ করতে পারে, এমন একটি প্রাণী রাখব না। নীলরতন নিতান্ত বাজে বলে না। এ ব্যাপারের পরেও যদি এরা ঘোরাফেরা করে, কাল সকালে না হোক রাত্রে চুপিসারে ওর ঐ হিংস্র দলবল নিয়ে একটা-কিছু করে ফেলা বিচিত্র নয়। নীলরতনের সম্বন্ধে এই ধরণের অনেক কীর্তিকাহিনী মিলের লোকেরা বলাবলি করে থাকে।

ষ্টেশনের উল্টা দিকে রেল-লাইনের উপর বসে তারা আবার খানিকটা শলা-পরামর্শ করে। তিন দিন পরে মাইনের তারিখ, নিবারণের কয়েক আনা মাত্র সম্বল, পুরা একটা টাকাও নেই। যতীন আর চরণেরও প্রায় ঐ দশা—তবে তাদের মস্ত সুবিধা, সবাই তারা দশ-বিশ মাইল হাঁটতে পারবে। শ্রীপতির ফিরতি গাড়িভাড়ার দরুন যা ছিল, সমস্ত সে নিবারণকে দিয়ে দিল। সকালে আটটা সাতাশের আগে গাড়ি নেই; ততক্ষণ ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকবে এখানে এই রাস্তার উপর—ঐ দুটিকে বেলুড়ে এক পিশির হেপাজতে রেখে আবার নিবারণ ফিরবে। ইতিমধ্যে শ্রীপতিরা রসুলপুরে গিয়ে লোকজন জোটাবে, ঘাড় নিচু করে অত্যাচার সইবে না তারা, কি করতে হবে সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে কালকের দিনটার মধ্যে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড এখানে রেল-রাস্তার পাশাপাশি চলেছে। চরণ ঘোষ, যতীন ও শ্রীপতি দ্রুত চলল। রাতের মধ্যে যতদূর পারা যায়, এগুতে হবে—এক এক মিনিটের এখন দাম অনেক।

পুবে ফরসা দিয়ে এল। এত জল হয়েছে মাঠে? বৃষ্টি তিন-চার দিন অবিরল ধারে হচ্ছে, তা বলে এত জল? বাঁ-হাতি মাঠটায় কিন্তু জল এত বেশি নয়। জায়গায় জায়গায় রাস্তা ছাপিয়ে জল-

প্রপাতের মতো জল পড়ছে। চরণ ঘোষ বলে, গতিক সুবিধের নয়। সন্দ হচ্ছে। আমার দাদাশ্বশুরের পাকা বাড়ি আছে সামনের গাঁয়ে। যাবে নাকি ?

ভোরের আলো পড়েছে রেল-রাস্তার পাশে, যেখানে শিশু ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে নিবারণ জেগে বসে আছে। এত জল ? কাল দিনমানে তো ছিল না, সন্ধ্যার পর থেকে বৃষ্টিটা বরং বন্ধ হয়েছে। এত জল জমল কি করে ?

কি ভয়ানক, জল বাড়ছে যে ! দেশ-দেশান্তরের জল ছুটে চলে আসছে। ঘাসের উপর শিশু দুটি ঘুমিয়ে ছিল, তাদের সেই অবস্থায় রেখে নিবারণ নেমে ছুটে গেল লাইনে। ঘরে ঘরে সব খিল দিয়ে ঘুমুচ্ছে। তিনটে পরিবার অসহায় ভাবে পথে উঠেছে, এরই মধ্যে বেমালুম ভুলে গিয়ে তারা দিব্যি নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। পাগলের মতো নিবারণ পাঁচিলের দরজায় ধাক্কা দেয়, দেয়ালের ধার দিয়ে চেঁচিয়ে ছুটোছুটি করে। ওরে বান ঢুকেছে। বেরিয়ে এস। বাঁচতে চাও তো রাস্তায় এসে ওঠ।

বন্যা। দামোদর বাঁধ ভেঙে তাড়া করে আসছে। সকালবেলা ষ্টেশনে তার এল, আটটা সাতাশের গাড়ি আসবে না। লোকের মুখে চোখে উদ্বেগ···তাই তো, গাড়ি কতকাল চলবে না—তাই দেখ। রেল-কোয়ার্টার, রাইস-মিল ও বাজার রেল-রাস্তা থেকে অনেক নিচে। দেখতে দেখতে রেল-ষ্টেশন লোকারণ্য হয়ে উঠল। মানুষ গরু-বাছুর বিছানাপত্র ট্রাঙ্ক-স্যুটকেশ—যে যতদূর বয়ে আনতে পেরেছে।

তোলপাড় লেগে গেছে ওদিকে প্রেমতোষের বাড়িতেও। নিচের ঘরগুলোর জিনিষপত্র দোতলা তেতলায় তোলা হচ্ছে। জল বাড়ছে, অতি দ্রুত বাড়ছে। সুপ্রীতির মুখ শুকনো, কথা সরছে না। সবে তো শুরু—আর খানিকটা দেখলে ভয়েই সে হার্টফেল করবে, এমনি অবস্থা। বড় গাড়িটা পেট্রোল ভর্তি হয়ে ফটকে দাঁড়াল।

অর্ধ-অচেতন সুপ্রীতি প্রেমতোষের গায়ে ভর দিয়ে গাড়িতে উঠল। জোরে চালাও গাড়ি—জোরে—খুব জোরে। বন্যাস্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে হবে। দুপুরের মধ্যে পৌঁছুতে হবে কলকাতা, মানুষের সব চেয়ে নিরাপদ আশ্রয়।

জল বাড়ছে, খরবেগে স্রোত আঘাত করছে রেল-রাস্তার গায়ে। কালভার্টের মুখে ঘোলা জল আবর্তিত হয়ে ঢুকবার চেষ্টা করছে। দুপুর নাগাত দেখা গেল, চারিদিক্ সমুদ্রের মতো হয়ে উঠছে, গ্রাম-বাড়ি-ঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, গাছের মাথা আর দু-একটা পাকাবাড়ির ছাত।

নিবারণ দেখতে গেল, মিলের কি দশা হয়েছে—যেখানে সে বিশ বছর কাটাল, যেখানকার লাইনের ঘরে তার শিশু সন্তান জন্মেছে, ও-বছর স্ত্রী মারা গেছে। সিগন্যাল-পোষ্টের ধারে দাঁড়িয়ে তার ঘরের ভিতর-বাহির পরিষ্কার দেখা যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখে। দরজায় শিকল তুলে দিয়ে মানুষজন পালিয়েছে, বাইরের জল ঘুলঘুলির পথে ঘরে ঢুকছে, সে জল জানালা দিয়ে দরজার ছেঁদা দিয়ে শত ধারে ফোয়ারার মতো বারান্দার দিকে পড়ছে। দেখতে চমৎকার। তক্তাপোষটা জলে ভাসছে—এক একবার জলের টানে দেয়ালের সঙ্গে আঘাত লাগে, জোরে

প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। বউকে যেদিন দেশ থেকে এখানে আনে, তারই আগের দিন ঐ তক্তাপোষ কেনা। ওরই উপর শুয়ে রোগে ভুগে ভুগে কঙ্কালসার হয়ে বউ মারা গেল। আজকে ছেলেমেয়ে নিয়ে সে পথে ভাসছে, তার ঐ সাধ-করে-কেনা তক্তাপোষও ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

পালাও—ওদিকে চলে যাও—রাস্তা ভাঙছে।

মানুষগুলো আরও ঝুঁকল, যেদিক্ থেকে ঐ রব উঠেছে। সত্যি, ভেঙে ফেলেছে ইটে গাঁথা পাকা কালভার্ট। দুর্বার স্রোত ওপারে যাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে, ভেঙে চুরে ভাসিয়ে পাক খেয়ে জল বেরুচ্ছে। বড় বড় গাছের ডাল এক নজর দেখা দিয়ে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে মাটি ধ্বসে গিয়ে জলধারা বিশাল পথ তৈরি করে নিল। রেল-রাস্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, শূন্যে পড়ে আছে কেবল বিরাট সরীসৃপের মতো কাঠে-আঁটা লোহার লাইনগুলা।

বিকাল হয়ে এল। গোরুগুলা হাম্বা রব করছে, আশ্রয়ার্থীদের ভিড় আরও বেড়েছে, খাওয়া-দাওয়া নেই—ছেলেমেয়ে কাঁদছে। ঘরের চাল ভেসে যায় ঐ একটা। চালে বসে মুরগি ডাকছে, পাশে মানুষ। চাল যদি দৈবক্রমে বড় গাছের গায়ে কি পাকা-বাড়ির পাশে গিয়ে লাগে তবে ওরা বাঁচবে; নয় তো তলিয়ে গেল বলে।

প্রেমতোষেরও পথে বিপত্তি ঘটল। এমন যে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, সেখানও জল উঠছে। চালাও—জোরে চালাও। ভাবছে, এ জায়গাটা নিচু বলেই এ রকম হয়েছে—এগুলে গ্রামের দিকে উঁচু রাস্তা পাওয়া যাবে, তখন আর অসুবিধা হবে না। জোরে—আরো আরো জোরে চালাও। আর দু-ঘণ্টায় কলকাতা পৌছনো চাই।

জল ক্রমেই বেশি…ইঞ্জিনে জল ঢুকে ষ্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। উপায়? উপায় কি এখন?

ভিতরে সিটের উপর উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গ গিয়ে পড়ল। সুপ্রীতি ভিজা কাপড়ে গাড়ির ছাতে গিয়ে ওঠে। গাড়ি নড়ছে, দুলছে যে! ভাসিয়ে নিয়ে যাবে নাকি? ডালপালা-মেলা বড় অশ্বথ গাছ—সেখান থেকে চিৎকার আসে, বাঁচতে চাও তো উঠে এস। গাড়ি ফেলে গাছে ওঠ—

প্রেমতোষ আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, গাড়িটা তোমরা ঠেলে দাও ঐ গাছ অবধি। দশ টাকা করে দেব। পায়ে ধরছি তোমাদের—

দশ দশটা টাকা! টাকার লোভে ঝুপঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল জন আষ্টেক। জলের উপরে যে টান, নিচে তার শতগুণ। ফেলে দেবার জন্য পায়ে কাছি বেঁধে কারা যেন টানছে। অনেক কষ্টে গাছের নিচে মোটর পৌঁছল।

সুপ্রীতি নবনীত-কোমল হাতে জড়িয়ে ধরল গাছের ডাল। চোখে চশমা, নীল সিল্কের শাড়ি সুঠাম সুশুভ্র দেহলতা ঘিরে আছে। সমস্ত জলে কাদায় মাখামাখি। কি ব্যাকুলতা তার চোখে-মুখে! ডালটা ধরে ঝুল খেয়ে সে উঠবার চেষ্টা করে। বলে, পারছি না তো!

মিহি সুরে এই ধরনের আবদার চিরকাল কত প্রশ্রয় কত প্রশংসা পেয়ে এসেছে! সে সুন্দর, তার অক্ষমতা অতি-মনোহর হয়ে দেখা দেয়। সুপ্রীতি বলে, গাছে চড়তে কি আমি পারি?

হাত তো দু-খানা রয়েছে, পা-ও আছে। আমরা পেরেছি, তুমি কি জন্য পারবে না, ঠাকরুণ? শ্রীপতির গলা। গাছের উপর চুপচাপ বসে আছে, আর হিংস্র উল্লাসে প্রলয়-দৃশ্য দেখছে। ঢল নেমেছে,

ক্ষীণপ্রাণ সেই দামোদর ছুটে বেরিয়েছে দিগ্‌দেশ পরিপ্লাবিত করে।

সুপ্রীতির গাল বেয়ে টপ-টপ ঝরছে চোখের জল। আঁকু-পাঁকু করে সে উঠবার চেষ্টা করে। আনাড়িপনা দেখে হাসি পায়। তোমার কর্ম নয় গো ঠাকরুণ, তোমার ও-হাত লাগে মুখে পাউডার ঘসতে, প্রিয়জনের গলায় মালার মতো পরিয়ে দিতে, ঘি-দুধ মাছ-মাংস যাবতীয় সুখাদ্য ইঞ্চি-মাপা হিসাব-করা পদ্ধতিতে মুখে তুলতে। জগতের কোন কাজে লাগে না। বিশ্ব সুদ্ধ মানুষ মুগ্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকে, কত উপমা কত কবিতা উচ্ছ্বসিত হব—শীতে মোলায়েম ফার আর গরম কালে রেশম-মোড়া অতি চমৎকার সুপ্রীতির হাত দু-খানা!

বন্যা ঘুচিয়ে দিয়েছে মানুষে মানুষে ব্যবধান। নইলে ধরুন, শ্রীপতি সরকারের সঙ্গে মিসেস সুপ্রীতি রাহার ঘনিষ্ঠতা—সাবধানে মাটি বাঁচিয়ে চলে যে সুপ্রীতি, মাটিকে তার বড় ঘৃণা, মাটির কণিকা ফর্শা অঙ্গে লেগে রূপ মলিন করে সেজন্য অনেক দামি সাবান খরচ করতে হয় তাকে—এ হেন রূপসী কাদা-মাটি মেখে শ্রীপতিদের সঙ্গে এক গাছের উপর বসবাস করল, কে ভাবতে পেরেছিল এ কথা? এ ব[illegible] অবশ্য নেমে যাবে কাল কি পরশু কিম্বা পাঁচ-দশ দিন পরে; [illegible]মা ধরিত্রী জলগুণ্ঠন সরিয়ে হেসে উঠবে। শ্রীপতিদের খোড়ো ঘর, কাঁচা গোয়াল, গোরু-বাছুর, উঠানে পালা-দেওয়া খড়ের আঁটি সমস্ত ভেসে গেছে। প্রেমতোষের পাকাগাঁথনির দেয়াল—জলধারা প্রহত হয়ে ফিরেছে, এক টুকরা ইট খসাতে পারল না। বন্যার পর সুপ্রীতি গিয়ে উঠবে তার পরম আরামের তেতলার ঘরটিতে। কিন্তু আর যে এক

বন্যা আসছে—অভ্রংলিহ প্রাসাদ, টাকার পাহাড়, বিলাস-ব্যসন, ফাঁকির জীবন ভেঙে চুরমার করে দেবে, তাকে রুখবার কি করেছ প্রেমতোষ সাহেব? দরকার হলে চাকর মতো গোবর-মাটি দিয়ে ঘর নিকোতে পারবে তো সুপ্রীতি দেবী? সেদিন গাছের ডালে নয় —শান্ত সুস্থ অকৃপণ ধরণীর উপর আমরা এক সঙ্গে দাঁড়াব। ছবিটা আন্দাজ করুন একবার। মিষ্টার প্রেমতোষ রাহার পাশে কারা ওসব? তাঁর মিলে সারাদিন চাল তৈরি করে দিয়ে চালের অভাবে যারা উপোস করত তারাই—বীর্যবান, ভরসার আলোয় উজ্জ্বল তাদের মুখ। এই যেমন বালুসর্বস্ব বিশীর্ণ নদীতে ঢল নেমেছে, সেদিনও ঢল নামবে ঐ মাংসলেশহীন ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ যতীন কামারের মধ্যে, ঐ সুরথ বিশ্বাস নীলরতনের মধ্যে—আত্মা যাদের মরে গেছে, উচ্ছিষ্টের আশায় স্পাই হয়ে খবরাখবর দেয়, আপনার লোকের মাথায় লাঠি মারে। আজকের এই সব ভেসে-যাওয়া মেঘম্লান অপরাহ্নে দুরন্ত প্রলয়-কল্লোলের মধ্যে শ্রীপতি আর এক মহাবন্যার তরঙ্গ-ধ্বনি শুনতে পেল।

কণ্ট্রোলের লাইন

খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে ছিল অতুল। তুড়িলাফ দিয়ে সে বারান্দায় এল। বলে, ছুটি মঞ্জুর। পুরো সাতটা দিনের লাটসাহেবি। কাউকে কেয়ার করব না।

বিস্তারিত জানবার জন্ম আবার সে জানলায় এসে দাঁড়ায়। দুই বেয়াইয়ে তখনো আলোচনা চলছে। রসিকমোহন বাতে পঙ্গু, অন্যের সাহায্য ছাড়া উঠে বসবারও অবস্থা নেই। প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে তিনি বলছেন, কি আর বলি বেয়াইমশাই, বলবার কিছু নেই। তবে আমার হল ঐ এক ছেলে—সাত নয়, পাঁচ নয়, একটি মাত্র। নিজে তো জ্যান্ত থেকেও মরে আছি—

মনোহরের কথাটা ভাল লাগে না। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলেন, আমার বাড়িতে বাবাজির কোন রকম অযত্ন হবে মনে করছেন নাকি?

না, না, না—সে কি কথা! জোরে জোরে রসিকমোহন ঘাড় নাড়লেন। কিন্তু স্বর শুনে কষ্ট হয়। যেন দ্বীপান্তরের হুকুম হয়েছে তাঁর ছেলের। মনোহর সাহস দিয়ে বললেন, কোন চিন্তা নেই ভাই। সে-ও হল শহর জায়গা। এই কলকাতার মতো নয়, তবু পাকা রাস্তা—রাস্তায় আলো—

রসিকমোহন বললেন, মিটমিটে গণ্ডা দশেক কেরোসিনের আলো থাকলেই কি শহর হয়? আমি গিয়েছি ও-রকম জায়গায়। একবার নয়, দু-দুবার। প্রথমবার পাঠ্য অবস্থায়—আমার এক মাসতুতো বোনের বিয়ের ব্যাপারে; আর শেষের বার সে-ও ধরুন বছর ত্রিশেক হয়ে গেল, অতুলের তখন জন্মই হয়নি। ভাবছেন, পাড়াগাঁ আমি জানিনে। খুব জানি। জানি বলেই এত ভাবনা আমার।

মনোহর বললেন, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, যে ক'দিন বাবাজি থাকবেন—ঠিক এখানকার মতোই রাখব। কি কি খান, কি রকম থাকেন—সমস্ত আমি বেয়ানঠাকরুণের কাছ থেকে একেবারে লিখে নিয়ে যাব।

অতুল হাসতে হাসতে এসে বলে, শোনগে করুণা, তোমার বাবা কি বলছেন। উকিল মানুষ—কথার ব্যাপারি কিনা, বাবাকে একেবারে জল করে দিয়েছেন।

করুণা বলে, বুদ্ধিটা কার বলো? আমার—আমার। বাবাকে লিখলাম, মামলায় তুমি কক্ষনো হারো না, জিতে জিতে সরকারি উকিল হয়েছে। মেয়ে-জামাই নিতে চাও তো নিজে চলে এস।

মনোহরের সঙ্গে এক চাকর এসেছে, নাম সুবলসখা। কটা রং। মাথার চুল প্রচুর ফাঁপিয়ে মাঝখান দিয়ে এলবার্ট টেরিকাটা। কলকাতা শহর দেখতে এসেছে, দু-পাঁচদিন থেকে যাবার ইচ্ছা। কিন্তু পাঁজি দেখে মনোহর বললেন, আজকের দিনটা খুব ভাল। তোকে আর একবার নিয়ে আসব সুবল, আজ তুই এদের সঙ্গে চলে যা। আমার কিছু কেনা-কাটা আছে, সেরে-সুরে কাল বা পরশু রওনা হব।

ছোট রেলে মাইল ত্রিশেক যেতে হয়। তারপর নৌকায়। ইছামতীতে মনোহরের বড় হাউস-বোট আজ দু-দিন নোঙর করা আছে। নৌকো গিয়ে উঠবে ওঁদের উঠোনের উপর বল্লেই হয়। অসুবিধা কিছু নেই।

যাবার সময় অতুল ও করুণা প্রণাম করতে এসেছে।

রসিকমোহন বললেন, পঞ্চাশ বোতল সোডা প্যাক করতে বলে দিয়েছি। সাত দিনে সাতে সাত্তে উনপঞ্চাশ—এক বোতল বাড়তি। একঢোকও জল খাবে না সেখানে। পাড়াগাঁ জায়গা—জল নয়, বিষের বেহদ্দ। নানারকম জার্ম গিজ-গিজ করছে।

অতুল ঘাড় নাড়ল।

চান করবে না। সাতটা দিন তো মোটে, চান না করলে কি যায় আসে? নিতান্ত যদি খারাপ লাগে, দুয়োর-জানলা বন্ধ করে ঘরের ভেতর গরম জলে মাথা ধুয়ে ফেলো। পাড়াগাঁয়ে এই প্রথম যাচ্ছ—খবরদার, খবরদার—

যে আজ্ঞে, বলে অতুল পুনশ্চ ঘাড় নাড়ে।

আর, রোজ একখানা করে চিঠি। মা-লক্ষ্মী, তোমাকেও বলে রাখছি। চিঠি না পেলে পাগল হয়ে যাব। সাত নয়, পাঁচ নয়—ঐ একটি ছেলে।

টিপ করে প্রণাম সেরে মা-লক্ষ্মী সরে পড়ে।

মনোহরকে ডেকে রসিকমোহন বলেন, শুনুন বেয়াইমশায়, আপনাদের ওদিকে বড্ড সাপের উপদ্রব—

মনোহর বললেন, মোটেই নয়। জ্যান্ত সাপ আমি জন্মে চোখে দেখিনি।

তা হোক, তা হোক। অতুল যেখানে থাকবে, তার চারদিকে কার্ব্বলিক এসিড ছড়িয়ে রাখবেন। এখান থেকেই কিনে নিয়ে যাবেন। আপনাদের পাড়াগাঁয়ে আবার খাঁটি জিনিষ দেয় না।

সন্ধ্যার পর প্রথম ভাঁটার মুখে বোট ছাড়ল। পালে জোর হাওয়া লেগেছে। মাঝি চুপচাপ হাল ধরে আছে। এই এতক্ষণ

বকবক করছিল করুণা। এখন থেমেছে, এবং ক্যাবিনের মধ্যে ঠিক ঠাহর হয় না—অনুমান হচ্ছে, চোখ দুটোও তার বুজে এসেছে। . অতুল বাইরে চলে এল। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না।

চাঁদের শোভা দেখছিস, কবিত্ব উঠেছে—না?

সুবলসখা ধাঁ করে ঘুরে বসল।

বলে, ভিতরে যান হুজুর। বড্ড ঠাণ্ডা।

হল কি তোর? একা একা বসে করছিস কি?

সুবল জবাব দেয়, মনে মনে কেষ্টনাম জপ করছিলাম। জাত-বোষ্টম কিনা!

অতুল বলে, বের কর্ জপের মালা—

আজ্ঞে?

হো-হো করে হেসে উঠে অতুল বলে, কেষ্টনামে আমারও খুব ভক্তি রে। বের কর্।

সুবলসখা বলল, মালাটালা নেই হুজুর। সে-সব কি নৌকোর পরে কেউ নিয়ে আসে?

আসে, বাপু আসে। এই যে রয়েছে। সুবলের পিছন থেকে কলকেটা খপ করে তুলে অতুল বলল, উঃ মালা যে বড্ড গরম এখনো। সবে জপে বসেছিলি—না?

আমার নয় আজ্ঞে, মাঝির কলকে। রাত-বিরেতে দাঁড় টানাটানি করে। শরীরটা চাঙ্গা করে নিচ্ছিল। আমি ওর মধ্যে নেই।

অতুল বলে, পিছন ফিরে ভক করে ধোঁয়া ছেড়ে দিলি, মাঝি তামাক খেয়ে তোর মুখের মধ্যে ধোঁয়া পুরে দিয়েছিল বুঝি? হাত-পা বেঁধে রেখেছে, চোখ তো কানা করে দেয়নি এখনো। সমস্ত দেখতে পাই।...হুঁকো আছে?

হুঁকোর দরকার কি, হুজুর? হাতের চেটোয় বসিয়ে নিন না এই রকম—এই রকম—

তারপর সামাল করে দেয়, দা-কাটা তামাক কিন্তু। বড্ড তলোক। আপনাদের কি চলবে এ জিনিষ?

চলত না তো কিছুই। বাবা বিছানা নেবার পর লুকিয়ে-চুরিয়ে শুধু দু-একটা সিগারেট চলে আসছে। লবঙ্গ চিবিয়ে সেণ্ট মেখে সাবধান হয়ে তবে যাই সামনে। কিন্তু চালাতে হবে—হুঁ—পুতুল হয়ে থাকব তো গাড-খাল ঠেলে যাচ্ছি কেন অদ্দূর?

যথানির্দেশ কলকে ধরে অতুল টান দেয়। তারপর হেসে ফেলল। বলে, আঙুলের ফাঁকে ধোঁয়া বের করা—এ কি আমার কর্ম? বসিয়ে বসিয়ে অকেজো করে ফেলেছে। নে, ধরিয়ে দে তুই ভাল করে।

সুবলসখা উঠতে যায়, অতুল হাত ধরে ফেলে।

পালাচ্ছিস যে! গেলেই হল? কষে টানতে হবে যে খানিকক্ষণ—

সুবল জিভ কেটে বলে, মনিব আপনি হুজুর। মনিবের সামনে—

রক্ষে কর। আমার ওসব ধাতে সয় না বাপু। মনিব হলেন শ্বশুরমশায়। মনিব আমার বাবা। আমার কাছে সব সমান, সব ভাই-ব্রাদার।

বলে জোর করে সে কলকে গুঁজে দিল সুবলের হাতে। বলে, ইস্, লজ্জায় মরে গেলি একেবারে! জলে পড়ে যাসনে দেখিস। ভাত বেড়ে দিলে এক্ষুণি তো গোগ্রাসে গিলবি। যত গোলমাল তামাকের বেলা?

নিরুপায় সুবলসখা তখন শোঁ-শোঁ করে দিল কয়েকটা টান। টান বটে, বাপরে বাপ—কলকের মাথায় আগুন দপ করে জলে

ওঠে। খুশি হয়ে অতুল তার পিঠ ঠুকে দেয়। 'বেশ—বেশ! এই না হলে মরদ! বাড়ি কোথায় রে তোর?

একটা সুদীর্ঘ দমের পর ফুরসৎ নিয়ে সুবল বলে, সাঁইতলা হুজুর। সুন্দরবনের কাছ বরাবর। সাঁইতলার নাম শোনেন নি? এই গাঙেরই উপর, পুরো ছুটো ভাঁটির পথ।

বিমুগ্ধ চোখে অতুল তার দিকে চেয়ে আছে। বলে, বড়-তামাকেরও প্রাকটিশ আছে—না রে? নইলে এমন দম তো খোলে না! বল্ বল্—মাথা নাড়বি তো মুণ্ডপাত করে ফেলব।

বিমর্ষভাবে সুবল বলে, সে আর হবার জো নেই। ওসব মুখের আগায় আনবেন না হুজুর, নিন্দে রটে যাবে। গোলামি করতে এসেছি।

এসেছিস কেন মরতে?

তা-ও বিনি-মাইনের গোলামি। সিকি পয়সা নিইনে হুজুর। শুধু পেট-খোরাকি।

অতুল অবাক হয়ে আছে। সুবলসখা বলতে লাগল, কর্তাবাবুর পা জড়িয়ে ধরলাম। পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন তাই রক্ষে। নইলে কি এখানে থাকতাম? কোম্পানির পাকা-দালানে প্রায় পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে উঠেছিল। কত পলাপলি করেছি হুজুর, তা দারোগা-বেটাদের যেন বিশ গণ্ডা চোখ; পিরথিম জুড়ে পেতে রেখেছে।

অতুল বলে, বড়-বিদ্যের ব্যাপারি নাকি তুই?

সুবল হাসিমুখে চুপ করে রইল।

ধরা পড়েছিলি?

মোটে দু-বার। একবার বড্ড বে-কায়দা হয়ে গিয়েছিল। একেবারে সিঁদের মুখে।

দারোগাকে সে কৈফিয়ৎ দিয়েছিল, মাঠের মধ্য দিয়ে কুটুমবাড়ি যাচ্ছিল—কিসে যেন তাকে উড়িয়ে এনে ফেলেছে ঐ জায়গায়। দারোগা বলে, সিঁদকাঠিটাও উড়তে উড়তে মুঠোয় এসে পড়ল নাকি? ছ-মাস জেল। বাড়ি ফিরলে বাপ আর ঘরে ঢুকতে দেয় না। বলে, কুপুত্তুর—তোর মুখদর্শন করব না।

অতুল প্রশ্ন করে, বাপ খুব ভাল লোক ছিলেন বুঝি?

গুণীলোক, হুজুর। অমন আজ-কাল জন্মায় না। সাঁইতলার মোড়লদের নাম শুনেছেন নিশ্চয়। একটা মাদার উপর আমরা বাহাত্তর ঘর। অঢেল বিল চারিদিকে, কিন্তু এক কাঠা ভুঁই নেই কারো, সব ন-পাড়ার চাটুজ্জেদের দখলে। এত বড় গাঁয়ের মধ্যে কেউ লাঙলের মুঠো ধরতে জানে না। কিন্তু কাজ করে সবাই—ভালো ভালো কাজ। আর তাতে উপায়ও বিস্তর।

অতুলের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। বলে, কি রকম? বলো তো দু-একটা শুনি—

এই এক নম্বর ধরুন নৌকোর কাজ। মাঝিমাল্লাগিরি নয়। বাদার কাছাকাছি বসত—বছর বছর বিস্তর লোক আসে কাঠ কাটতে, মোমমধু ভাঙতে, গোলপাতার চালান নিতে। রাত্রিবেলা বাঘের ভয়ে সব মাঝখালে নৌকো বেঁধে ঘুমোয়। বাঘ পৌছতে পারে না সত্যি, কিন্তু সাঁইতলার মোড়লদের নিজস্ব ডিঙি আছে, তাদের আটকায় না। সকালবেলা ব্যাপারিরা দেখে, কোমরের গাজিয়া কাটা। তখন গলুয়ে মাথা খুঁড়ে মরে—আর কি করবে?

টেরই পায় না? মরে ঘুমোয় নাকি?

সুবল সগর্বে বলে, আমাদের সাঁইতলার কাজকর্ম—বাজার-চলন যা সব দেখে থাকেন, সে ধরনের নয়। আমার বাবা জানতেন

নিদালি-মন্তোর, ধুলো পড়ে গেরস্তর গায়ে ছুঁড়ে দিলে এমন ঘুম ঘুমোবে যে তাকে সুদ্ধ চুরি করে নিয়ে গেলেও হুঁস হবে না। আর এক রকম আছে মাড়ি-আঁটার মন্তোর। মন্তোর পড়ে দিলে কুকুরের মাড়ি এঁটে যাবে, শব্দ-সাড়া করে লোক জাগাতে পারবে না। আমার বুড়োদাদা জানতেন—চাবি-খোলার মন্তোর। সে অবশ্য চোখে দেখিনি হুজুর, গল্প শুনেছি। যাঁরা প্রত্যক্ষ দেখেছেন, তাঁদেরই মুখের গল্প। মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে যত শক্ত তালা হোক, হাঁ হয়ে যাবে।

রাত অনেক হয়েছে। চাঁদ ডুবুডুবু। বোট নিঃশব্দে একেবারে তীরলগ্ন হয়ে চলেছে। কেওড়াবনের ডালে ডালে জোনাকির ঝিকিমিকি। চুরিবিদ্যা শিখানোর নানা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলাপ চলছে। গোড়ায় ছেলেরা ঘটিবাটি সরাতে শুরু করে। এ-বাড়ির জিনিষ নিঃশব্দে ও-বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। ধরাও পড়ে। তারপর হাত পোক্ত হয়ে এলে মাতব্বরদের চোখের উপর দিয়েই জিনিষপত্র বেমালুম সরে যাবে; নজরে আসবে না। শেষ পরীক্ষাটা বড় বিষম। সবাই যে পারে তা নয়—তবে যে পেরেছে, তার সম্বন্ধে আর কোন উদ্বেগের হেতু থাকে না। গাছের মগডালের বাসায় বসে পাখী ডিমে তা দিচ্ছে, গাছে উঠে তোমাকে চুপি-চুপি ডিম সরিয়ে আনতে হবে। পাখী উড়বে না, টেরই পাবে না, যেমন তা দিচ্ছিল তেমনি দেবে। এই যেদিন পারবে, সাঁইতলার মুরুব্বিরা তোমাকে অবাধ ছাড়পত্র দিয়ে দেবেন, সমস্ত ভূ-ভারতের মধ্যে তুমি নির্ভয়ে রোজগার করে খেতে পার।

মনে মনে তুলনা করে সুবলসখা গভীর নিশ্বাস ফেলল। সে নিতান্ত অকৃতী, এঁদের পায়ের কাছে দাঁড়াবার যোগ্যতা তার

নেই। তাই তো প্যাঁচে পড়ে গেল; সিঁদের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে, খপ করে পিছনের পা চেপে ধরল চৌকিদার। দিন দুপুরে তার হাতে-দড়ি নিয়ে গেল—তবু অত বড় গ্রামের একজন কেউ একটিবার তাকে চোখের দেখা দেখতে এল না। ফিরে এসেও সে আমল পায় না। বাপের গালি খেয়ে মনের ঘৃণায় সে দেশান্তরি হল।

দিল্লি-লাহোর, ঢাকা-শহর কাঁহা-কাঁহা-মুল্লুক করে সে বেড়ায় নি, এই বাংলা দেশেরই মধ্যে তোমার আমার বাড়ির নিকটবর্তী সুন্দরবনে ঘুরেছিল প্রায় তিন বছর। অপূর্ব রহস্যভূমি—চারিদিক্কার বসতি ও কর্মব্যস্ততার মাঝখানে ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে এমনি একটি জায়গা আজও টিকে আছে, এই আশ্চর্য। এক মউলের পানসিতে সুবল-সখা দাঁড়ি হয়ে গেল। চাকের মধু ভেঙে এনে চালান দেওয়া—বড্ড লাভের কারবার। কতবার কত অঞ্চলে গিয়েছে তারা! ভাঙনখালির মোহানা, মালঞ্চের দ', আঠারবেঁকি, রায়মঙ্গল! মিশমিশে কালো জল রায়মঙ্গলে—জল কি মেঘ ধরা যায় না। কি টান, কি রকম ডাক! কাজকর্মে খুশি হয়ে মনিব তাকে ভাগিদার করে নিল। লাভের দেড় আনা বখরা। কিন্তু ঐ মুখের কথাই, হিসাবের বেলা তা-না-না-না করে সেরে দেয়। পেটে যা খেয়ে নিয়েছিল সেইটাই মুনাফা।

অতুল রাগ করে ওঠে, আর রায়মঙ্গলের ঢেউ খেয়ে এলি, সেটা কিছু নয়?

সুবলসখা বলে যাচ্ছে, মনে বড় দুঃখ হল, হুজুর। পানসির পাল খুলে বোঁচকা বেঁধে দুর্গা বলে হাঁটা দিলাম। আর এক মাঝির সঙ্গে সেই পালের দরদস্তুর করছি, ধরে নিয়ে গেল। তারপর থেকে থানার বাবুদের সঙ্গে বড্ড জমজমাট হয়ে উঠল মোটে আর ছাড়তে

চায় না। এই বছর দুই শুধু একটানা বাইরে আছি। সরকারি উকিলের চাকর কিনা—এখন আবার শুদ্ধ হয়ে গিয়েছি।

অতুল জিজ্ঞাসা করে, আর রায়মঙ্গল যেতে ইচ্ছে করে না তোর?

নিশ্বাস ফেলে সুবল বলে, আর গিয়েছি! সাঁইতলার আমি মুখ পুড়িয়েছি, হুজুর। নইলে বলুন দিকি, আমাদের মধ্যে কে কবে কলকাতা শহর দেখতে গিয়েছে!

অতুল এবার গিয়ে মাঝিকে আক্রমণ করল। হালের মুঠো চেপে ধরে বলে, খানিক জিরিয়ে নাও, মাঝি। আমি ধরছি, তুমি তামাক খাওগে।

আপনি? না-না জামাইবাবু, সে কি কথা? রাখতে পারবেন না। আচ্ছা—খালে গিয়ে পড়ি, তখন না হয় হাল ধরবেন।

অতুল বলে, পারব, ধরে বসে থাকতে আমি বেশ পারব মাঝি। ঐটেই শিখেছি এতকাল ধরে। হাঁটতে পারিনে, ছুটতে পারিনে, বসে থাকতে আমি খুব পারি।

কিন্তু আধ রশিটাকও এগোয়নি—পাল ঘুরে বোট কাত হয়ে যায়। ছলাৎ করে খানিকটা জল এসে পড়ল খোলে। কাঁচা ঘুম ভেঙে করুণা আর্তনাদ করে ওঠে।

অতুল ভিতরে গেলে করুণা বলল, মা গো মা—সব জায়গায় পাগলামি! এখনো আমার গা কাঁপছে।

অতুল বলে, রায়মঙ্গল যাচ্ছিলাম গো। মিশমিশে জল, পাহাড়ের মতো ঢেউ—

উহুঁ, যেতে হত গাঙের নিচে—পাতালে—

যে চুলোয় হয় যেতে পারলে বাঁচি, কেবল তোমাদের এই সুখের পৃথিবীটা বাদ দিয়ে।

সে কি? সাত নয় পাঁচ নয়—একটা বর তুমি আমার। বলে বাহুবেষ্টন করে করুণা ফিক করে হেসে ফেলল।

অতুল বলে, ফাজিল হয়ে গেছ—বাবার মতন করে কথা বলছ—উঁ?

রাতের মধ্যেই তারা পৌঁছেছে। সকালে অতুল অনেক বেলায় উঠল। হাই তুলে সে জানলায় এল। বাগান। সুঁড়িপথ খিড়কির দুয়োর পার হয়ে গলিতে গিয়ে পড়েছে। গলির দু-ধারে খোড়ো বাড়ি, মাঝে মাঝে জঙ্গলে ভরা পতিত জমি। অনেকটা দূরে গলি মিশেছে একটা মাঝারি গোছের রাস্তায়। তার ওদিকে—ভাল নজর চলে না, অতুল ঠাহর করে করে দেখছে। কোথায় ছিল করুণা, সামনে এসে দাঁড়ায়।

কি?

করুণা বলে, সরে এস। বাগানের এঁদো মাটি, গ্যাস বেরুচ্ছে। আচ্ছা মানুষ তো তুমি! শেষে ম্যালেরিয়ায় ধরুক।

স্ত্রীর দিকে চেয়ে হেসে অতুল চলে, দেখ—মাত্র ক'টা দিনে ছুটি আমার। ডেঁপোমি করবে তো থাপ্পড় ঝেড়ে দেব।

করুণা নিরীহ মুখে বলে, কি করি বলো। তুলোর বাক্সর ভিতর থেকে আঙুর তুলে আনা হয়েছে। বাবা আমাকে পই-পই করে বলে দিয়েছেন। কলকাতার মাণিক ভালোয় ভলোয় আবার কলকাতায় পৌঁছে দিতে পারলে বাঁচা যায়।

আবার তাগিদ দেয়, তবু দাঁড়িয়ে? আটটা সাতাশ। এর পর পিত্তি পড়বে। মুখ ধুয়ে চট করে আর কিছু না হোক, সন্দেশগুলো খেয়ে ফেল। ভয় নেই, সন্দেশে কুইনিন মিশিয়েছি। খেলে অসুখ হবে না।

অতুল তখন নিচের দিকে চেয়ে চিৎকার করছে, এই সুবল, সুবলসখারে—

করুণা বলে, ডাকাডাকি করছ—এ-ঘরে সুবল আসবে কি করে ?

আসতে পারবে না ? মার্বেলে পা পিছলে যাবে বুঝি !

আসতে দিতে নেই। বাইরের চাকর-বাকর দোতলার ঘরে এসে ঢুকবে, সে কি কথা !

অতুল বলে, তা হলে আমি যাই।

করুণা এবার সত্যি রাগ করে বলে, যাবে না। লোকে দেখলে বলবে কি ? মান-ইজ্জত তুমি থাকতে দেবে না দেখছি।

মহা মুশকিল ! অতুল একটু ভেবে বলে, আচ্ছা, লোকে যে সময় দেখবে না—তখন যেতে পারি তো ?

করুণা বলে, শোন, আমার মা নেই। বাড়িতে যাদের দেখছ, সব বাইরের লোক। একগুণ হলে দশগুণ করে ছড়াবে। বাবা না আসা পর্যন্ত গার্জেন আমি তোমার।

বিরক্ত কণ্ঠে অতুল বলে, কেউ গার্জেন নয়। কেরানির রবিবার আছে, রাস্তার মুটেরও রাত্তির বেলা মাথায় মোট থাকে না। কিন্তু দিন-রাত্তির চব্বিশ ঘণ্টা আমাকে মান বয়ে বেড়াতে হবে—কি জ্বালা বল তো ! এলাম এই এদ্দূরে, মানইজ্জতও অমনি পিছু-পিছু চলে এসেছে। রেহাই নেই—

অতুল তকে তক্কে ছিল, ঠিক দুপুরে পা টিপে টিপে নেমে পড়ল।

কি রে ? হচ্ছে কি ?

সুবলসখা চমকে ওঠে ? করছেন কি—একেবারে ঘরের মধ্যে চলে এসেছেন ? ওদিকে যে রামচরণ ড্রাইভার।

দেখতে পায় নি।. চোখ বুঁজে নাক ডাকছে।

সুবল বলে, নাক ডাকে কি রকম? ফটকের সামনে বসে থাকবার কথা—

পালিয়ে যেতে না পারি, সেই বন্দোবস্ত?

সুবল জিভ কাটল। ছি-ছি, কি যে বলেন, হুজুর! বাবু বলে গেছেন, চব্বিশ ঘণ্টা গাড়ি তৈরি থাকবে। হুজুরের যখন মরজি হবে, যতদূর খুশি—ঘুরে আসবেন। পায়ে ধুলো লাগবে না।

হাত-পা গুটিয়ে গাড়ির গর্ভে ঘোরা? তুই হতভাগা রাজপুরকল ঘুরে এসে বললি এমন কথা? ঘুরব বলেই বেরিয়ে এসেছি। চল্

সুবল চোখ কপালে তুলে বলে, পায়ে হেঁটে? ও বাবা, সে আমি পারব না। মাপ করতে হবে।

অতুল স্তব্ধ হয়ে রইল। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, সত্যি কথা বলছি সুবল, জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে। শ্বশুরবাড়ি এলাম স্ফূর্তি হবে বলে। তা যমের বাড়ির আগে স্ফূর্তি-টুর্তি হবে না দেখছি।

কথার ধরণে কষ্ট হয় সুবলের। কলকেয় আগুন দিয়ে ভাঙা হাত-পাখায় নিঃশব্দে সে বাতাস করতে লাগল। অতুল তাকিয়ে তাকিয়ে ঘরখানা দেখছে। জানলার বালাই নেই, এই দুপুরবেলাতে আবছা আঁধার। টিকে ধরাবার জন্যে টেমি জ্বেলেছে, আলোয় বিচলিত হয়ে কতকগুলো আরশুলা উড়তে লাগল। অতুল বলে, তোফা জায়গা। রোদ আসে না, হাওয়া আসে না, ম্যালেরিয়া ধরবার ভয় নেই। তা বাবুরা নিজে না থেকে, তোদের দিয়ে দিয়েছে এমন খাসা ঘর?

দেখা গেল, রামচরণ ঘুমুলেও গাড়ি দিয়ে ফটকের মুখ ঠিক আটকে রেখেছে। গাড়ি ছুটল। সুবলসখা বসেছে ড্রাইভারের

পাশে। অতুল সিটের পিছনে ঠেশ দিয়ে আধ-ঘুমন্তের মতো বসে আছে।

হঠাৎ একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

ও কি রে?

বাজারখোলা হুজুর। আজ রাত্রে যাত্রা হবে, তার বন্দোবস্ত হচ্ছে। বিনোদ-শার দল। সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ পালা।

কখন রে, কখন?

রাত্তির দশটা-এগারোটায় শুরু হবে। মেয়েছেলেরা রান্নাবান্না সেরে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে আসে কিনা! সকাল অবধি নির্ঝঞ্ঝাট।

অতুল যথাসম্ভব মুখ বাড়িয়ে দেখে।

আঃ, একটু থামাও না, ড্রাইভার।…আচ্ছা, কলার ভেউড় বসাচ্ছে কেন রে?

সুবল বুঝিয়ে দেয়, তুষ-ভরতি সরা বসবে ওর উপর। তুষে তেল ঢেলে আলো জ্বালবে। চারিদিক আলো আলোময় হয়ে যাবে।

গাড়ির দুয়োর খুলে অতুল বলে, চল্ তো দেখে আসি।

না হুজুর, সে হয় না। হাত জোড় করে সুবলসখা বলে, বাজারে নামলে এক্ষুণি সবাই বলবে, কে? না—মনোহরবাবুর জামাই। বাবু এসে যখন শুনবেন—

অতুল রাগ করে রামচরণকে বলল, গাড়ি ফেরাও, আর কাজ নেই।

কিন্তু বড্ড মজা লাগছে সুবলের, তাকে আর গাড়ি চড়তে দেয় কে! গাড়ি চড়ার আয়েশ যতটা সম্ভব দীর্ঘব্যাপী করতে চায়। বলে, আজ্ঞে, এরই মধ্যে? মোটে এইটুকু এসেছি।

কত দূর গিয়ে ফিরতে পারব, গজ-ফুট হিসেব করে দিয়ে গেছেন নাকি তোর বাবু?

ফিরে এসে উঠানে নেমে করুণ-কণ্ঠে সুবল বলে, কি করব হুজুর, হুকুমের গোলাম। দোষ নেবেন না।

দোষ? মনিবের কথা অক্ষরে অক্ষরে মানিস, তুই [illegible] আদর্শ ভৃত্য। বলে অতুল তার হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিল।

সুবল অবাক হয়ে তাকায়। অতুল বলে, বখশিস দিলাম রে, প্রভুভক্তির পুরস্কার—

গলা নামিয়ে সুবল বলে, কি করতে হবে বলুন তো—

চলে আয়, রামচরণ ব্যাটা তাকাচ্ছে কি রকম।

এদিকে এসে অতুল বলে, খুব ভাল যাত্রা গায় নাকি বিনোদ শা?

আজ্ঞে, কোকিলের গলা। বাইশখানা মেডেল ঝুলিয়ে আসরে দাঁড়ায়।

নিশ্বাস ফেলে অতুল বলে, আমার আর কি তাতে? দিনমানেই বেরুতে দেয় না, তার রাতের বেলা—

অনেক রাত্রে টু-টু-টু—খিড়কির বাগানে পাখীর বাচ্চা ডাকছে, এই রকম আওয়াজ। করুণা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। পাশবালিশটা শিয়রের বালিশের উপর শুইয়ে অতুল ভাল করে কম্বল ঢাকা দিল। তারপর বেরিয়ে পড়ে।

সুবলসখার বান্দাবাসে খুঁজে নেই। খিড়কি খুলে সোজা রাস্তার

জড়িয়ে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে আঁধার একটা দিকে দুজনে ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে বসল।

এক সময়ে ফিসফিস করে সুবল বলে, রাত কাবার হয়ে এল, হুজুর। পোহাতি তারা উঠেছে।

মুগ্ধ হয়ে শুনতে শুনতে অতুল বলে, কোথায়?

সুবল বলে, আকাশ ছাড়া তারা আর কোথায় ওঠে, হুজুর? উঠুন, ধরা পড়ে যাব।

আরও খানিক পরে অনিচ্ছুক মন্থর পায়ে অতুল সুবলের পিছু-পিছু চলে আসে। জ্যোৎস্না ডুবে গেছে, অন্ধকার। ব্লাক-আউটের সময়, কলকাতা শহরে ঠুঙির মধ্যে তবু কিছুক্ষণ আলো জ্বালিয়ে রাখে, এ-সব শহরে এরা ও-পাটই তুলে দিয়েছে।

বাগানে ঢুকতে গিয়ে তারা স্তম্ভিত। রামচরণ আলো নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। মনোহরও এসে পৌঁছেছেন। উপরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে তিনি হাঁক দিলেন, কি রে—হয়েছে কি?

রামচরণ বলে, আমার গায়ের কাপড় নিয়ে সরে পড়েছে। উঠে এখন গায়ে দিতে পারছিনে। চোর-ছ্যাচোড়কে ঠাঁই দিয়েছেন বাবু···এই যে—ইদিককার দুয়োর খুলে চলে গেছে।

সুবলের ইচ্ছে করে, তার টুঁটি চেপে ধরে বলে, চুরি করবার কি জিনিযখানা রে! গন্ধে ভূত পালায়। তা-ও যদি নেংটি ইঁদুরে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে না রাখত!

অতুল বলে, মাড়ি-আঁটার মন্তোরটা যদি শিখে আসতিস, হতভাগা! রামচরণ, শ্বশুরমশায়—সব সুদ্ধ দিতাম আজ মাড়ি এঁটে।

বিনাবাক্যে তারা দৌড় দিল। পিছনে যেন জুতার আওয়াজ। ছোট্, ছোট্—এরকম ভাবে সদর রাস্তায় দৌড়ান ঠিক নয়।

শ্বশুর-বাড়ির এদের এড়াতে গিয়ে পুলিশের নজরে পড়বে নাকি? এমনই তো সুবলের সঙ্গে ও-বেটাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

অনেক লোক সারবন্দি বসে আছে রাস্তার পাশ দিয়ে। কণ্ট্রোলের লাইন। একটা জাতির মেয়ে-পুরুষ-শিশু ভিখারি হয়ে রাস্তায় বসেছে, দেখ। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই প্রায় অভগ্ন থাকে এ লাইন। মাঝে মাঝে রূপ বদলায়—একটু-আধটু রকমফেরের মাত্র। গৃহস্থের বউরা পেটের ক্ষুধায় এসে বসেছে, তারা চলে যেতে না যেতে আসে শিশুরা। বাচ্চা বাচ্চা ভিখারি কথা ফোটেনি ভাল করে। পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হচ্ছে, দেখছে তার নিঃস্ব নিরানন্দ চেহারা; মুঠোয় পয়সা—হাত উঁচু করে আছে চালের ঠোঙাটার জন্য। এখন পুরুষ মানুষের লাইন; রাত জেগে তারা জায়গা পাহারা দিচ্ছে।

লাইনের মাঝখানে ঝুপ করে বসে পড়ল অতুল আর সুবলসখা।

বিশ্রী জায়গাটা। দুর্গন্ধ—ড্রেনের পাঁকে আর মানুষের কাপড়-চোপড়ে। কি করা যাবে—নাকে কাপড় দিল অতুল। একজনে চেঁচিয়ে ওঠে, কোথাকার খাঞ্জা খাঁ হে? পিছনে গিয়ে বোসো—সকলের পিছনে।

সুবল ফিস-ফিস করে বলে, চলুন তাই। একপহর রাত থাকতে বসে আছে জায়গা আগলে। এগুলে খুনোখুনি হবে।

দেখতে দেখতে তাদের পিছনেও জন ত্রিশেক বসে গেছে। ... হয়ে অতুল সামনে পিছনে তাকায়। না, একেবারে ভিন্ন জাত হয়ে ভিন্ন সমাজের মধ্যে বসে গেছে। ওরা মোটরে চড়ে খোঁজাখুঁজি করবে, এত নিচেয় নজর নামবে না। নিশ্চিন্ত হয়ে পাশের লোকটির সঙ্গে সে আলাপ জমিয়ে তোলে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা! একই শহরে প্রায় এক জায়গায় বসবাস—তবু এত দূরবর্তী এরা।

কি ভাই, কতক্ষণ বসে থাকতে হবে এই রকম ?

লোকটি বিরক্ত স্বরে বলে, কি জানি—কতক্ষণ। এক একদিন রোদ হাঁ-হাঁ করে। দোকান খোলা হবে, গার্ড বাবুরা সব ঘুমুচ্ছে—তারা উঠবে, মুখ ধোবে, চা-সিগারেট খাবে—তবে তো! তারপরে চার-পাঁচ কুড়ি ঠোঙা দিয়ে হয়তো বলে দেবে, আর হবে না, আজ আর নেই—ফুরিয়ে গেছে।…ও কি ? ও দোকানেও শুরু হয়ে গেল নাকি ?

অতুল বলে, ওখানে ভিড় নেই— ঐখানে যাও না কেন ?

ওরা দেয় কেরাসিন। দুপুর দুটো থেকে। লোকটা নিশ্বাস ফেলে বলে, একা মানুষ—এদিক্‌কার পাট সেরে ওদিকে আজ আর হয়ে উঠবে না।

সুবলের পিছনে যে লোকটা বসেছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে সে বলে, তোমাদের দেখিনি কোন দিন। কোন্ বস্তিতে থাক তোমরা ?

সুবল বলে, অনেক দূর—

তা এত জায়গা ছেড়ে এখানে মরতে এসেছ কেন ? চলে যাও। এ আমাদের পাড়ার মাল—আমরাই পাব শুধু।

সুবল বলে, তাই যাব। চুপ-চাপ বসে থাকি একটু। সকাল হলেই চলে যাব।

ফর্সা হয়ে এসেছে। লোকটা আরও দেখে দেখে বলে, মশায়দের চেহারা যেন বাবু-বাবু ঠেকছে।

উঁহু—

না বললে শুনি নে। এই যে—ফুটফুটে রঙ। তা আমাদের ভিক্ষের ভাগ বসাতে এসেছ কেন ? এটা কি উচিত ?

অতুল বলল, ভাগ চাচ্ছিনে বাপু। আমাদের ভাগ আগেভাগে আলাদা করা থাকে, আপনা আপনি এসে যায়, লাইনে বসতে হয় না। যত খুশি খাই, ফেলাই, ছড়াই—ফুরোয় না।

আগের লোকটি চোখ টিপে বলে, বুঝেছি—গার্ডবাবুদের সঙ্গে বন্দোবস্ত রয়েছে? কানে কানে ফিস-ফিস করে বলে, উঠে যাবেন না বাবু। কেন, কি জন্যে যাবেন? চালের গরজ না থাকে, আমাকে দিয়ে দেবেন। পাঁচজন করে খায় আমার বাড়ি—এক সের চালে কি হবে বলুন! বসুন বাবু, ভাল হয়ে বসুন।

একখানা ইট জোগাড় করে সে বসেছিল। খাতির করে সেটা অতুলের দিকে এগিয়ে দিল।

অতুল বলল, তোমার কোঁচড়ে কি ভাই?

বকফুল। আঁধারে আঁধারে পেড়ে নিয়ে এলাম। এ নিয়েও কাড়াকাড়ি বাবু। এত বড় অশ্বথের মতো গাছ—পাতা নেই শুধু ফুল—আর এখন গিয়ে দেখুন্ গে, কুঁড়ি অবধি খুঁটে নিয়ে গেছে।

শিশির-ভেজা এক মুঠো লাল কুরুবক সে বের করল। বলে, নিন বাবু, পকেটে পুরে রাখুন। ভাজা খেয়ে দেখবেন, তোফা লাগবে। ডালনাও হয় কাচকলা আর নারকেলের দুধ দিয়ে।

আবার কানে কানে বলে, আপনাদের চাল দু'ঠোঙা কিন্তু আমার।

করুণা বলে, ভোরে উঠেই বেরিয়েছিলে? তোমার বেড়ানো বাতিকটা ছাড় দিকি এই ক'টা দিন। নতুন জায়গা—ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করে যদি! এই এক্ষুনি বাবা তোমার খোঁজ করছিলেন।

তুমি কি বললে?

বললাম না কিছু। পাশবালিশের উপর কম্বল আরও ভাল করে টেনে দিলাম। করুণা খিল-খিল করে হেসে ওঠে। বলে, টের পেলে বাবা বকাবকি লাগাতেন। আমার মন খারাপ হয়ে যেত। বিশেষ এই আজকের দিনে—

হঠাৎ সে প্রশ্ন করে, আজকে কোন তারিখ বল তো?

তারিখ? বিব্রত হয়ে অতুল বলে, আবার পাঁজি-পুঁথির হাঙ্গামা এনে ফেললে!

দেয়াল-ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল, শনিবার—তেরোই মার্চ উনত্রিশে ফাল্গুন।

খুব মজার দিন আজকে—

অতুল বলে, কিসের মজা? তারিখের মধ্যে আবার মজা কিসের?

দেখ, বলতে পারলে না। আমাদের বিয়ে হয়েছিল উনত্রিশে ফাল্গুন।

অতুল ভেবে বলে, ফাল্গুন মাসে হয়েছিল বিয়ে। সেটা উনত্রিশে? এতও মনে থাকে তোমার!

কি দেবে আমাকে?

তুমিই বলো—

করুণা ঘাড় দুলিয়ে বলে, বলব না—বলব না তো। খুব নতুন একটা কিছু—

নতুন ডিজাইনের একটা শাড়ি কি গয়না—

করুণা আগুন হয়ে উঠল। শাড়িতে শাড়িতে পাহাড় জমেছে। সোণা-জহরতে মুড়ে রেখে দিয়েছ। ফের যদি শাড়ি-গয়না আসে কোনদিন, শাড়ির আঁচলে ফাঁস টেনে মরে থাকব।

হঠাৎ কৌতুকে তার চোখের মণি নেচে ওঠে। বলে, এনেছ—ঐ যে কি নিয়ে এসেছ পকেট ভরতি। ফুল এনেছ? ঐ তো আমি চাই।

বকফুলের রাশি বের করল অতুল।

করুণা আবদার করে বলে, তুমি আমার চুলে পরিয়ে দাও।

পরাব মানে? ভাজা করে দিতে হবে।...আচ্ছা আচ্ছা—মুখ হাঁড়ি কোরো না, দিচ্ছি দুটো। করা যাক এ দুটো বাজে খরচ আজকের দিনে।

পরিয়ে দিয়ে অতুল বলে, বিয়ে একলা তোমার হয়নি। হয়েছিল আমারও। আমায় কি দেবে?

দেব না, দিচ্ছি। এদিক-ওদিক তাকায় করুণা। কাছে—খুব কাছে আসে—

ছিটকে সরে গেল অতুল। দু-হাতে মুখ ঘসে আর বলে, দুত্তোর! পাউডার লেপটে দিলে খানিক। গন্ধে গা কেমন করছে।

হল্লা আসছে। কণ্ট্রোল-লাইনে চাল দেওয়া শুরু হয়েছে বুঝি! অতুল ঘসে ঘসে পাউডার তুলে ফেলে। কণ্ট্রোল-লাইনের ধারে ড্রেনে যেমন দুর্গন্ধ, এ-ও যেন তেমনি কতকটা।

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা

কারাপ্রাচীরের আড়ালে আছেন মহামানবেরা, তাঁদের নমস্কার !

সকল বিক্ষোভে অচঞ্চল, অগ্নিগর্ভ কিন্তু সমাহিত পরম শান্ত। লোভ ও লালসার অতীত, কোন লঘুতা তাঁদের স্পর্শ করেনি। ভয় করাবার যে সব প্রণালী মানুষের দুষ্টবুদ্ধি এতকাল ধরে আবিষ্কার করেছে, তাঁদের কাছে তা অকর্মণ্য হয়ে গেছে।

জাতিতে জাতিতে হিংসা আর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম—এ কলঙ্ক তাঁদের নয়। নিদারুণ বিপর্যয়ের সামনে কর্মহীন কোটি কোটি মানুষ—এই কাপুরুষতার ভাগী তাঁরা নন। দুঃখ তাঁদের নোয়াতে পারেনি। মানুষ পাঁক ছিটিয়ে চিরকালের জীবনধারা মলিন করে দিল, এ দলের বাইরে তাঁরা।

কামানের ধূমে আর প্রচারের মিথ্যাভাষণে পৃথিবী ও আকাশ কলঙ্কিত হয়েছে। মলিন হয় নি আকাশের অনেক উপরে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী ; মলিন হন নি যে বন্দীরা অপাপবিদ্ধ প্রভাত-সূর্যের আরাধনা করেছেন। ভারতের শুদ্ধ আত্মা আটক হয়ে আছেন। নমস্কার !

বিপিন জেল থেকে বেরুল। সে গিয়েছিল যুদ্ধ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবার অনেক আগেই। কোথায় কি একটা বেয়াড়া বক্তৃতা করেছিল। গলায় অজস্র ফুলের মালা দুলিয়ে জনতার উল্লাস-ধ্বনি শুনতে শুনতে মনের আনন্দে জেলে ঢুকেছিল। আজকে ছাড়া পাচ্ছে। কিন্তু কই, চেনা মানুষ একটা নেই তো! কোথায় গেল দু-বছর আগেকার তারা ?

পায়ে পায়ে সে কংগ্রেস-আফিসে চলল। আফিস বন্ধ। পাশের

পাঁউরুটিওয়ালা বলল, খবর রাখ না, কোথাকার মানুষ হে! হিন্দু-মোছলমানে ভারি যে হাঙ্গামা হয়ে গেল। আফিস খুলবে না এখন বহুত দিন। বাবুরা নেই। ধরা পড়েছে অনেকে। আর সব ছুটোছুটি করছে দাঙ্গা ঠেকাতে।

তখন বিপিন গেল নদীর ঘাটে। নৌকা অনেক রয়েছে, বিশ-পঁচিশখানা হবে।

ভাড়ায় যাবে, ও মাঝি? বারান্দি-কৈলাসকাঠি, বেশি দূর নয়—

কেউ মাছ কুটছে, কেউ স্নান করছে, কেউ বা ছইয়ের নিচে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। জবাব দেয় না, যেন টাকা-পয়সার দরকার নেই কারও, কিংবা এতগুলো মানুষ একসঙ্গে কালা হয়ে গেছে। অনেক হাঁকাহাঁকির পর একজন হাত নেড়ে বলে, পথ দেখ মশাই, উ-ই ওরা যদি যায় তো দেখগে।

হঠাৎ নজরে পড়ে না, প্রায় রশি দুই উত্তরে গাবতলায় ইতিমধ্যে এক নূতন ঘাট হয়েছে। বিপিন চলল সেদিকে। পিছন থেকে সদুপদেশ এল; যাচ্ছ মশাই, ট্যাঁক সামলে—

আর একদন বলে, আর মুণ্ডটাও। বে-সামাল হলে ক্যাঁচ করে ওটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দেবে।

বিপিন খরদৃষ্টিতে একবার পিছনে চেয়ে হনহন করে চলল।

কপাল ভাল। চেনা লোক পাওয়া গেল—আহম্মদ মাঝি, তাদেরই গ্রামে বাড়ি। মাঝি বাজার থেকে সওদা করে ফিরছিল।

নৌকো আছে তো আহম্মদ? বেশ হয়েছে, নিয়ে যেতে হবে।

আহম্মদের পিছু-পিছু সে ডিঙিতে গিয়ে বসল।

তারপর, ইদিকে হোগলা-বনে এসে বেঁধেছ—কাণ্ডখানা কি?

আহম্মদ বলে, যখন জাত আলাদা, ঘাট আলাদা হওয়া তো ভাল বাবু।

বেশ, বেশ, পাকিস্তান বুঝি? ক'দিন হয়েছে এ সমস্ত? বড় দুঃখে বিপিন হেসে উঠল।—আমাকে নিয়ে যাবে তো? না, তা-ও মানা?

আহম্মদ বলে, কি যে বল—ওতে গুনাহ্ হয়। এইটুকু ছাওয়াল চোখের পরে তুমি এত বড়টা হলে। হিন্দু-মোছলমান এ সমস্ত তো এই হালে হয়েছে।

কথা বলছে আর কি যেন ভাবছে আহম্মদ। হুঁকোর জল ফিরিয়ে সে তামাক সাজতে বসল।

ওদিকের খবর কি, আমাদের বাড়ি-টাড়ি গিয়েছিলে এর মধ্যে?

মুখ শুকনো করে আহম্মদ বলে, আর খবর! আট দিন আটকা পড়ে আছি। নৌকা দেখলেই নাকি শালারা ডাঙায় টেনে তুলছে। কি মুশকিলে পড়লাম বাবু, এক-এক জনে এক-এক রকম বলে যায়। ঘর-দোর গোরু-জরু সব আছে কি গেছে! দাঁড় টানবে বলে পাড়ার একটাকে নিয়ে এয়েছিলাম, বিষ্যুৎবার থেকে সে হারামজাদারও নিশানা নেই—দলে পড়ে ঘর পোড়াতে বেরিয়েছে।

গম্ভীর মুখে সে তামাক টানতে লাগল। তারপর মুখ তুলে বলে, তুমি যাও তো ভরসা করে যাওয়া যায়। নসিবে যা থাকে হবে। সঙ্গে লোক জুটিয়ে নিতে পার দু-একজন?

একজনকে বলে কয়ে দেখা যেতে পারে। সে বিপিনের পিসতুতো ভাই নীরদ—জোয়ান-যুবা ছেলে, একটা বন্দুকও আছে তার।

নৌকা ছাড়বে কখন?

জোয়ার লাগলে। এই ধর না, কত আর— রাত চার-ছ দণ্ড হবে।

রাত্তিরে যাবে, বল কি ?

আহম্মদ বলে, ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় ঐ তো ভাল বাবু। ও সময় বদলোক সব গাঁয়ে গিয়ে ওঠে, গাঙে-খালে বড় কেউ থাকে না। ছোট্ট ডিঙি—সাঁ করে বেরিয়ে যাব আমরা।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হল নীরদদের ওখানে। নীরদ বলে, জেল খেটে শরীর তো সলতে করলে, কিন্তু কি করলে এই এদ্দিনে বল তো ?

তোরা যে কিছু করলি নে। সকলের বোঝা বইতে গিয়ে কেবল হাজার কতক মানুষ মুখ থুবড়ে মরে যাচ্ছে। বিপিনের চোখে জল আসবার মতো হল। চুপ করে সামলে নিয়ে বলে, বন্দুকটা নিস রে নীরদ। জীবন দিয়ে তো বশ করতে পারলাম না, এখন বন্দুক বাগিয়ে ভয় দিতে হবে।

নীরদ বলে, বন্দুক থানায় দিয়ে এসেছি। ও জিনিষ কাছে রেখে বিশ্বাস আছে ?

তুই তো পীস-কমিটীর লোক।

নীরদ বলে, কিছু বিশ্বাস নেই দাদা। চিরকাল যাদের সঙ্গে চালে-চালে বসত করলাম, একটা দিনের মধ্যে তারা সব কি হয়ে গেল! কাউকে বিশ্বাস করি নে, নিজেকেও নয়। কি ফ্যাসাদ হবে, কে সরিয়ে ফেলবে, আগে থাকতে তাই জমা দিয়ে এলাম।

সুমুখ-আঁধার রাত্রি। আহম্মদ অতি-আলগোছে বৈঠা জলে ছুঁইয়ে রেখেছে, বাইছে না, পাছে শব্দ হয়। স্রোতের টানে ডিঙি চলেছে। বিপিন আর নীরদ সঙ্কীর্ণ ছইয়ের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে আছে। একটু

ঝিমুনি এসেছিল হয় তো, হঠাৎ যেন বিপিনের সর্বশরীরে বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে গেল।

আলো—এত আলো!

ততক্ষণে ডিঙি পাক খেয়ে কেয়াবনে ঢুকছে। বৈঠার আগা মাটিতে বসিয়ে আহম্মদ প্রাণপণ বলে ডিঙির সমস্তটা কেয়াঝাড়ের ফাঁকে ঠেলে দিল। ছই মড়-মড় করে উঠল, কেয়ার কাঁটায় আহম্মদের পিঠ কেটে রক্ত বেরুল।

নীরদ বলে, ইঃ, এখনও আগুন দেওয়াদেওয়ি চলছে! তবে আর ঠাণ্ডা হল কই?

ওপারে ঠিক নদীর উপরে গ্রাম। নদী বড় নয়। চোখের সামনে ঐ ভয়ানক ছবি···বিপিন আর পারছে না, দু-হাতে কেয়ার ঝুরি শক্ত করে ধরেছে, নইলে জলে পড়ে যাবে বুঝি! বাতাস উদ্দাম হয়েছে, সোঁ-সোঁ আওয়াজ হচ্ছে, অগ্নি-শিখা চালে চালে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, হাজার ঘোড়-সওয়ার হুড়োহুড়ি লাগিয়েছে যেন। কাঁচা গাছপালা অবধি ঝলসে পুড়ে যাচ্ছে, এত দূর থেকেও মনে হয়, আগুনের আঁচ গায়ে লাগে। পটাপট বাঁশের গেরো ফুটছে—ঐ ঘরের আড়া ভেঙে পড়ল...গোলাটা একেবারে ফাঁকায়, গোলার এক পাশ পুড়ে ধানের স্তূপ আগুন হয়ে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে···

আহা, কোন্ হতভাগার বছরের সঞ্চয় গো!

নীরদ বলে, জেলে ছিলে বিপিন-দা, দেখ--আমাদের বীরত্ব একবার চোখ ভরে দেখে নাও।

আহম্মদ বলে, উঃ, যেন দিনমান হয়ে গেছে! উদিকে সরে চাপান দিয়ে থাকা যাক খানিকক্ষণ।

তারপর?

বেগোনো গুন টেনে মরতে হবে আর কি!

নীরদ বলে, গুনের দড়ি নিয়ে ঐ ডাঙা দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। পারবে তো?

আহম্মদ চুপ করে থাকে। ডাঙার জীব মানুষ; আজ মানুষের সবচেয়ে ভয় ডাঙার উপর।

আর খানিক পরে নীরদ বলে, কেয়াফুলের মিষ্টি গন্ধ, রাজ্যের সাপ আসে এইসব গাছে। কতক্ষণ আর থাকবে মাঝি? আগুন তো সারারাত জ্বলবে।

ঝপ্‌ঝাস করে আহম্মদ দিল বৈঠায় এক টান।

খুশি হয়ে নীরদ বলে, বেশ! আর দু-খানা বোঠে এগিয়ে দাও তো, আমরাও ধরি। উড়িয়ে নিয়ে চলে যাব এই জায়গাটা, দেখছ কি!

এক বাঁক গিয়ে এক দোয়ানি, নৌকা তার মধ্যে ঢুকল। আহম্মদ বলে, একটু ঘুর হবে বাবু, কি করা যায়। মানুষগুলো হন্যে হয়ে গেছে। আমার তো জ্বর এয়েছে।

তামাকের পিপাসা হল বিপিনের; বৈঠা ফেলে টেমি জেলে সে নুড়ি ধরাতে বসল। হঠাৎ অনেক দূর থেকে প্রবল চিৎকার, আল্লা হো আকবর!

আহম্মদ নীরদের দিকে হাত আর মুখের ইশারা করে বলে, জোরে বাও—জোরে। ইদিকে রয়েছে, ওপারে যাব—শিগগির।

তারপর বিপিনের উপর ক্ষেপে উঠল।—নিবোও, নিবোও বাবু, ফুঃ ফুঃ—ভাল আক্কেল, মানুষ খুন হয়ে যায় আর তোমার হাতে কলকে।

কথা শেষ না হতে ওপার থেকে পালটা জবাব আসে, বন্দে

আতঙ্কে মাঝি যেন অসাড় হয়েছে, বৈঠা জল ছেড়ে উঁচু হয়ে ওঠে, ডিঙি ঘুরে যায়। নিশ্বাস ফেলে কাতরকণ্ঠে আহম্মদ বলে, ওপারে মোছলমান—এপারে হিন্দুরা। পিরথিমে আর নিশ্বাস ফেলবার জায়গা থাকল না, বাবু।

ও কি, ওখানে?

দাঁড় ফেলে জল তোলপাড় করে ভাউলে নৌকা যাচ্ছিল একখানা। এরা পাশ কাটিয়ে আগে চলল।

কারা যায়?

আহম্মদ বলে, হুঁ।

বলি কোয়ানথে আসতিছ তোমরা?

এবার আর সাড়াই দিল না। আহম্মদ প্রাণপণে বৈঠা চালায়, আবার চেয়ে চেয়ে দেখে, তারা কত পিছনে পড়েছে। শেষে নিশ্চিন্ত হয়ে আপনার মনে বলে, কথা বলে কি ফ্যাসাদ হবে, বোবা থাকাই ভাল।

বিপিন অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল, তার বাড়ির কি দশা হয়েছে কে জানে! অস্থির মন, আর দুধারে দারুণ স্তব্ধতা। যেন শ্মশানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তারা। বছর দুয়েক আগে ফুলের মালা পরে আদালতে দাঁড়াল, তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছিল, ফিরে এসে এই রকম ব্যাপার দেখবে?

আহম্মদ বলছিল, শোন বাবু, একটা কথা বলে রাখি, কেউ যদি নাম-টাম জিজ্ঞাসা করে, ফস করে বলে বোসো না। কি জানি, কে কোন জাতের, কার কি মতলব। হিঁদু বললে মুশকিল, মোছলমান বললেও মুশকিল।

যুদ্ধের কথা উঠেছিল সেই সময়। নীরদ দু-একটা খবরাখবর

দিচ্ছিল। বিপিন জেলে আটক ছিল, তার অনন্ত কৌতূহল। আহম্মদ বলে ওঠে, এই দেখ বাবু কটা রঙের সাহেবগুলো—ওদের মধ্যেও তাহলে হিঁদু-মোছলমান রয়েছে। নইলে মরছে কেন যুদ্ধ করে? চেহারা দেখে জাত চিনবার জো নেই আজকাল।

ডিঙি গ্রামে পৌঁছল, তখন দূরবিস্তৃত চরের উপর চাঁদ দেখা দিয়েছে, ম্লান জ্যোৎস্না উঠেছে। ঘড়ি দেখে নীরদ বলল, সাড়ে তিনটে। আহম্মদ আরও কিছু এগিয়ে তাদের পাড়ার ঘাটে নৌকা রাখবে। সন্তর্পণে বিপিন আর নীরদ বালির উপর দিয়ে এগুচ্ছে।

ও—হো—হো!

একটা অতি বীভৎস আওয়াজ অনেক—অনেক দূর থেকে নদীর চরে হাওয়ায় ভেসে আসছে। বিপিনের সর্বদেহ শিরশির করে ওঠে। নীরদ বলে, কোন হতভাগা আছে কোথায় পড়ে; আধমরা করে রেখে গেছে। চল—চল—

দু-বছর আগেকার নিজের গ্রামখানা—আজ অপরিচিতের মতো লাগছে। একটা ঝড় বয়ে গেছে, এই রাতেও তা বোঝা যাচ্ছে। যেমন, রাস্তার মাথায় কেশবের গোলদারি দোকানখানার ঝাঁপ খোলা, যত্ন করে ব্যবস্থা মতো খুলে রাখা হয়েছে তা নয়, একখানা ঝাঁপ মজা-পুকুরের খোলে, আর একখানা ভাঙা-চোরা অবস্থায় ঐ রাস্তার নর্দমায়! দোকানে কেশব নেই, মালপত্র কিচ্ছু নেই, চাল আর মসুরি সামনেটায় অপর্যাপ্ত ছড়িয়ে আছে। কেশবের তাড়াতাড়ি সরাবার দরুণ যদি এই রকম হয়ে থাকে তো আলাদা কথা। মোটের উপর, সামাল সামাল পড়ে গেছে, সন্দেহ নেই। পদে পদে শঙ্কা জাগে

…যেন শত্রুর ঘাটিতে অনধিকার-প্রবেশ করেছে, কোন গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে তারা মুখোমুখি দাঁড়াল বলে !

একেবারে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে চললে বিপিনদা, দেখ, দেখ— এখানেও খাণ্ডব-দাহনের নমুনা।

সাহাদের বাড়িতে বিয়ে হয়েছিল ফাল্গুন মাসে, অনেক উঁচু করে নহবৎখানা করেছিল, সেটা সত্ত পুড়েছে, ভাল করে এখনও আগুন নেভেনি। সামনের দেবদারু-খুঁটি দুটো খাড়া আছে, এক এক ঝাপটা বাতাস আসছে, আর আধ-পোড়া খুঁটির আগুন বিকট হাসি হেসে উঠছে।

ঝুপসি-ঝুপসি গাছপালার অন্ধকার থেকে চড়া গলায় হুকুম এল, হল্ট—খাড়া রও।

দাঁড়াতে হল। ইচ্ছে করে নয়, নিতান্ত পা চলে না বলে। মালকোঁচা-আঁটা জন পাঁচ-ছয় সারবন্দি রাস্তার উপর আসে।

আমরা এখানকারই ভাই, বদ-মতলব নেই।

রাত দুপুরে ভাগবত-পাঠ করে বেড়াচ্ছ, না ?

সত্যি ভাই, সত্যি। এই সবে ঘাটে এসে নামলাম। বিপিনের জিভ জড়িয়ে আসে, আর বলতে পারে না।

শাট আপ ! বজ্র-গর্জন ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে টর্চের জোরালো আলো এসে পড়ে মুখের উপর। পেছন থেকে একজন বলে, না না. এ রমজানের দল নয়।

গলা শুনে বিপিন চিনিতে পারে, দেহে যেন প্রাণ ফিরে পায়। হ্যাঁ বাবা সুধীরকেষ্ট, আমি…আমি বিপিন—

দুত্তোর ! সুধীর হতাশভাবে হাতের লাঠি গাছতলার দিকে ছুঁড়ে দেয়। বলে, গাঙ পেরিয়ে রমজান ঢালি আসবে খবর পেয়েছি।

হৈ-হৈ পড়ে গেছে। শহর থেকে ভদ্রলোকদের এনে দু-রাত আজ মশার কামড় খাওয়াচ্ছি। কাকস্য পরিবেদনা। আর এল যদি তো হয়ে গেলেন আমাদের বিপিন কাকা। বুঝলেন মদনবাবু, খবর তা হলে একদম বাজে।

একজন—সে-ই মদন নিশ্চয়,—জবাব দিল, নেভার। বাজে হতে পারে না। খুব সম্ভব তারা পথ ভুল করেছে। যে রকম দেশ আপনাদের মশাই।

এদের দিকে চেয়ে বলল, বড্ড ঠকালেন আপনারা। সিটি দিতে যাচ্ছিলাম, একসঙ্গে ত্রিশজনে ঘিরে ফেলত, ত্রিশখানা লাঠি মাথায় পড়ত। নীরদের দিকে সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে চেয়ে বলল, ওটি তো বিপিনকাকা বুঝলাম—এটি ?

বিপিন তাড়াতাড়ি বলে, সম্পর্কে আমার ভাই হয়।

কি রকম ভাই ? কি জাত ?

নীরদ উষ্ণভাবে কি বলতে যাচ্ছিল, সুধীরকৃষ্ণ বলে, আহা, চটবেন না। বেকায়দায় পড়লে হামেশাই আজকাল ভাই-ব্রাদার হয়ে যাচ্ছে কিনা !

বিপিন বলে, বাড়ি যাচ্ছি সুধীর। আছে তো ঘরবাড়ি ? কেমন আছে সব ?

কেউ নেই, চলে গেছে। মদনবাবু, সেই যে দেখাচ্ছিলাম, বকুল-গাছওয়ালা বাড়িটা—

কোথায় গেল তারা ?

সুধীর বলে, তা জানি না। জানবার কি ফুরসৎ ছিল ? কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, এখনও তার জের মেটেনি। বুঝলেন না, সবারই 'আপনা বাঁচা' অবস্থা, কে কার খোঁজ নেয় ?

বিপিন আর পারে না, পথের ধুলার উপরই বসে পড়ল।

আহা, এখানে কেন? ঐ যে মাদুর রয়েছে।

নীরদ বলে, বসে কাজ নেই বিপিন-দা, একবার দেখে আসি।

মদন রাগ করে বলে, দেখুনগে—দরজায় পাঁচসেরি তালা ঝুলছে। দালান-কোঠাওয়ালারা তো আগে ভাগে সরে পড়ে, মশাই। পুড়ে মরে খোড়ো-ঘরের লোক।

সুধীর বলে, এক সা-পাড়াতেই ধরুন তিন তিনটে বন্দুক। হাঙ্গামার এক হপ্তা আগে তারা টাকাকড়ি গয়নাপত্র নিয়ে নৌকো ভাসাল। বড়মানুষগুলো যদি মানুষ হত, তবে আর ভাবনা ছিল কি!

বিপিন কাতরকণ্ঠে বলে, আমার কি রকম হচ্ছে, আমি চললাম।

আঁধারে ভূতের মতো যাবেন না কাকা। বলা তো যায় না। বসুন মিনিট দুই, আমরাও দু-একজন যাচ্ছি সঙ্গে।

গোটা চারেক আম ও ছাতিম গাছ ঘেঁষাঘেষি হয়ে আছে, মাঝখানে মাদুর পেতে ভলন্টিয়ারদের আস্তানা হয়েছে। একজনে গুঁড়ি ঠেস দিয়ে বসে ছিল। সুধীর বলে, ঘুমুচ্ছিস যে বড়, ও শিবু? বললাম চা করে খা—ঘুম ছেড়ে যাবে—

শিবু বলে, দেশলাই কোথা? দেশলাই দাও, শুকনো পাতা জ্বালিয়ে কেটলি চাপাই।

হুঁ, লাট সাহেব আমার, দেশলাই জ্বালাবেন। এক আনা করে বাক্স হয়ে গেছে জানিস? আগুনের অভাব কি রে? কত জায়গায় গনগন করছে, এখনও তোর মত বিশটাকে চিতেয় পুড়িয়ে আসা যায়।

ও-হো—ও-হো-হো—

সেই শব্দ। খুব নিকটে এবং যেন দীর্ঘতর হয়েছে। এমন স্বর মানুষের গলা দিয়ে বেরোয়! সুধীর বলে, গোপলা বুড়োর ভিরকুটি

দেখ—বড্ড দুঃখ, তাই চেঁচাচ্ছে। আর যারা চেঁচায় না, তাদের যেন কোন দুঃখ নেই।

এই এতক্ষণে নীরদ একটিমাত্র কথা বলল। বলে, গলাটা কেটে দিয়ে এসগে, আর চেঁচাবে না।

তা হলেও চেঁচাবে। নাছোড়বান্দা, বুঝলেন? জখম হয়েছে, তা হাসপাতালে গেল না কিছুতে। ঘর গেছে, সিন্দুক গেছে, গরু গেছে, বউটাও মরে জুড়িয়েছে, তবু বাপু চেঁচাচ্ছিস কি জন্যে শুনি?

বলতে বলতে সুধীর হাসে। চোখের উপর এই সব দেখে দেখে এর মধ্যেও হাসতে পারে তারা। শিবুকে ঠেলে দিয়ে বলে, এই, উঠবি না? কেটলি গরম করে নিয়ে আয়, ভারি জুত লাগবে এই সময়।

নীরদ বিপিনের হাত ধরে টেনে উঠে পড়ে।

আপনারা আসতে লাগুন, আমরা এগোই। আপনাদের দেরি হবে বুঝতে পারছি।

কয়েক পা এসে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, মানুষের সর্বনাশ, আর ওদের পার্বণ লেগেছে। ডিফেন্স-পার্টি, না হাতী!

বিপিনের বাড়ির বাইরের দিকে অন্তত অত্যাচারের চিহ্ন নেই। চকমিলানো বনেদি কোঠা, সেকেলে মজবুত গাঁথনি, পুরো দু-হাত চওড়া দেয়াল, বড় বড় গোল পেরেক-আঁটা অত্যন্ত ভারি সিংদরজা, কুড়ুল-শাবল লাঠি-ঠেঙায় এখানে কিছু করা চলে না। নীরদ বলে, তা নয় দাদা, খেয়াল করে নি, কিংবা কি জন্য হয়তো দয়া করে গেছে। তোড়জোড় কি কম, এই বাজারে টিন টিন পেট্রোল নিয়ে এসেছে—কোথেকে জোগাড় করে কে জানে! ইট না পুড়ুক, দুয়োর পুড়ত, ভিতরে ঢুকতে আটকাত না।

দুয়ারের তালাটা একটু টানাটানি করে দেখে।

বলেছে ঠিক। সুকুমার আর খোকাখুকিকে নিয়ে বৌদি চলে গেছেন। বুদ্ধির কাজ করেছেন—যা গতিক, সরে যাওয়াই ভাল। সাতবেড়েয় আছেন, খোঁজ নিয়ে দেখগে—

বিপিন বলে ওঠে, আর কি আছে রে? নেই।

নাঃ, নেই! সকালে শুনতে পাবে। দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে দাদা? কি রকম থমথম করছে জায়গাটা! চল, ওদের ওখানে গিয়েই বসি। রাত বেশি নেই।

পথে পা বাড়াতেই—বাপ রে বাপ—বোঁ-বোঁ করে সে কি কুচো-ইটের বৃষ্টি! এলোপাথাড়ি আসছে, একের পর এক, নিশ্বাস ফেলতে দেয় না—এই রকম।

চাপা গলায় নীরদ বলে, গাছের নিচেয় এস। শিগগির—শিগগির। জোছনার আলোয় তাক করছে।

আমাদের ছাতের ওপর থেকে আসছে না?

বিরক্তভাবে নীরদ বলে, কোন্ চুলো থেকে আসছে, কে জানে? কোথায় ঘাপটি মেরে আছে কোন্ শালা।

গাছতলায় এসেও বিপিন সভয়ে উপরে তাকায়। ডালপালার অন্ধি-অন্ধিতে আঁধার জমাট হয়ে আছে। চকচকে সড়কি শানিয়ে এ জায়গায় কেউ যদি থাকে, তার তাক ফসকে যাবার কথা মোটেই নয়।

ওরে বাবা, খুন করেছে রে!

বড় এক ইটের টুকরা এসে পড়ল বিপিনের চোয়ালে। চোখে আঁধার দেখল, আর্তনাদ করে সে মাটিতে পড়ল, রক্তের ধারা বয়ে গেল। ডিফেন্স-পার্টির দল একটা নয় চার-পাঁচটা। চারিদিক থেকে

সকলে ছুটল, তীব্র হুইস্‌ল দিচ্ছে—বিপদের সঙ্কেত-ধ্বনি, এর মানে—যে যেখানে আছ, সাবধান হও।

পালাল কোথা ? কোন্‌ দিকে ?

নীরদ বিপিনের ছাতের দিকে দেখিয়ে দেয়।

কি বলেন, মাথা খারাপ হল না কি ? তাদের কি পাখনা হয়েছে, উড়ে গিয়ে ছাতে উঠবে ?

নীরদ বারম্বার বলে, আমি স্পষ্ট দেখেছি, সমস্ত ঢিল ঐ—ঐদিক থেকে এসেছে।

মদন শুনছিল, এতক্ষণ কিছু বলে নি। ঘাড় কাত করে সে বলে উঠল, হয়েছে—

কি হল ?

যা হবার তাই হয়েছে, রমজানেরা এসে গেছে। এসেই ঢুকেছে বাড়ির মধ্যে।

তালা বন্ধ যে !

তালা ভাঙতে কতক্ষণ লাগে, মশাই ? চলুন, আমরাও ভাঙিগে। ঢুকে পড়ে, তারপর একজন কেউ সামনে আবার তালা লাগিয়ে দিয়ে পিছনের কোন দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে। একেবারে নিশ্চিন্ত। ক'দিন এসেছে, তারই বা ঠিক কি! ঝানু লোক তারা, ফাঁকায় দাঁড়িয়ে আমাদের মার খাবে নাকি ? প্রথম মোহড়ায় কেল্লা ঠিক করে নিয়েছে।

অনেকেরই মুখ শুকিয়ে গেল।

মদন বলতে লাগল, দাঁড়ান, লাইন করে নিন। বরঞ্চ, খানিকটা ওদিকে সরে যাই চলুন। দু'জন করে এক সঙ্গে। আগের দু'জন টর্চ, তার পিছনে দু'খানা কুড়ুল, তারপর আপনারা সব। কুড়ুলের ঘায়ে তালা ভেঙে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ব।

ইট মারবে না ?

ইট কেন, হয়তো অনেক-কিছু। হাতাহাতিও হতে পারে। যারা আহত হবে, তাদের জন্যে এই আটজন রইলেন রিজার্ভ ফোর্স।

গাছতলার সেই নিরাপদ ঘাটিতে বিপিন শুয়ে থাকল, নীরদ রইল তার পাশে। বাহিনী ছুটল। তালা ভেঙে নির্বিঘ্নে কেল্লাও দখল হয়ে গেল। খাঁ-খাঁ করছে এতবড় বাড়িখানা, শত্রু যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে, কোন পাত্তা নেই। আশ্চর্য !

তা হোক, হুঁশিয়ার সবাই।

জনকয়েক সিঁড়ির মুখ আগলে রইল, আর সকলে চলল উপরে। খানিক পরে চেঁচামেচি আসে।

তবে রে বাছাধন !

নিচে থেকে সুধীর হাঁক দেয়, পেয়েছেন ?

পেয়েছি। মোটে একটা ছোকরা।

আরও আছে। আচ্ছা করে ঠেঙানি দিন, তা হলে বলে দেবে, আর সব কোথায়। আধ-মরা হয়ে গেলে আলসে ডিঙিয়ে নিচে ফেলে দেবেন।

ছেলেটি তখন কাতর হয়ে চেঁচাচ্ছে, আমি—আমি এই বাড়ির লোক, আর কাউকে আমি জানি না।

মিথ্যে কথা।

সত্যি কথা। আমি এর মা, আমি বলছি।

রাত্রির শেষ প্রহরে এতগুলি অচেনা লাঠি-সোঁটাওয়ালা লোকের মধ্যে মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। ভয়লেশহীন কণ্ঠস্বর, ঘৃণা যেন প্রতি কথায় উপচে পড়ছে। মা বলতে লাগলেন, ইট মেরেছে তো বেশ করেছে। যা করবি কর্ তোরা, আমাকে মার্, ওকে মার্, একেবারে

মেরে ফেল। অত্যাচার লুঠ-তরাজ কিছুই তো বাকি নেই। গ্রাম জ্বালিয়েছিস, আমাদের কত সুখের গ্রাম ছিল!

দলে আয়োজনের অবধি নেই, হাতে লাঠি আছে, সড়কি আছে, ছোরা আছে—সবাই তবু সুড়-সুড় করে নেমে চলে গেল।

সুধীর বলে, কি হল?

বলছে, ওরা নাকি এই বাড়ির লোক।

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বলেছে, অমনই ছেড়ে দিয়ে নেমে এলেন?

মদন বলল, আপনি চেনেন, আপনি একবার গিয়ে দেখে আসুন না।

জটলা হতে লাগল। মা ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে নেমে এলেন, সেই ছোকরা তাঁর পিছনে। বললেন, এখানে গোল কোরো না—যাও তোমরা। ওঃ, সুধীরকেষ্ট, তোমারই দল? তবু ভাল। নাথ-পাড়ার মেয়েরা কাল থেকে এসে রয়েছে, একজনের বড্ড অসুখ। কেউ যাতে গোলমাল করতে না আসে, বাইরে তালা দিয়ে রেখেছি। ঘরের মধ্যে সবাই গাদাগাদি হয়ে আছে। ভরসা করে একটা আলো জ্বালিনি। তোমাদের কাণ্ড দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেছে, তোমরা যাও।

সুধীর বলে, কি সর্বনাশ মদনবাবু, আপনারা সুকুমারকে পাকড়েছিলেন যে! কাকীমা, ইট মেরেছে কাকে জানেন? বিপিনকাকাকে। মাথা ফেটে গেছে, সাংঘাতিক লেগেছে।

সুকুমার স্তম্ভিত হয়ে যায়।

বাবা যে জেলে—

মায়ের কঠোর কণ্ঠ করুণ অবরুদ্ধ হয়ে আসে।—জেলে গিয়েছিলেন এই পোড়া দেশের মানুষের জন্যে। জেলে জেলে জীবন খোয়ালেন, কি হল?

তাড়াতাড়ি ছুটল সবাই। সুকুমার কাঁদতে কাঁদতে বাবার পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ে।

আমি মেরেছি বাবা, আমি—আমি। মাটির উপর পাগলের মতো সে মাথা খোঁড়ে।

নীরদ বলে, তা কি হবে? অমন করিস নি। আঁধারে বোঝা যায় না, চিনতে পারলে কি মারতিস? আমাদেরই ভুল, সকাল হলে আসা উচিত ছিল।

বিপিন ক্ষীণকণ্ঠে বলে, সকালের দেরি কত নীরদ?

এই তো পোহাতি তারা উঠেছে, পূবে ফরসা দেবে এইবার।

প্রশ্ন করেই আহত অর্ধ-অচেতন বিপিন আবার কি-একটা ভাবতে লেগেছিল। নীরদের কথায় তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, পূবে ফরসা দিচ্ছে, সূর্য উঠছে, মানুষ মানুষকে চিনবে, ঐসব পোড়া ঘর-বাড়ির ছাইয়ের গাদায় ফুল ফুটে উঠবে।

মানুষ ও গোরু

সাত বিঘা ধান-জমি ধনঞ্জয়ের। মন্বন্তরের পর জমিতে এবার সোনা ফলেছে। ধান কাটার মরশুম। মাঠের ধান ঘরে আসছে। গোবর-মাটি দিয়ে নিকানো তকতকে উঠান; নতুন ধানে মাটি দেখবার জো নেই। মেনকা এমনই হাসে; ইদানীং কারণে অকারণে দিনরাত তার মুখে হাসির তুবড়ি ফুটছে।

পিশতুতো ভাই অমূল্য খানিকটা লেখাপড়া শিখে নকীপুর ইস্কুলে মাষ্টারি করে। সে বড় ভাল, ধনঞ্জয়কে বড্ড ভালবাসে। সেখানে গিয়ে ধনঞ্জয় তিনদিনের ছুটি করিয়ে তাকে নিয়ে এল।

সেই কোন সকালে দু-ভাই মাঠে গিয়েছে। বিশ্বাসদের গোরুর গাড়িটা চেয়ে নিয়ে গেছে। আঁটির পর আঁটি সাজিয়ে গাড়ি বোঝাই হল। একটা মাত্র গোরু তাদের, আর একটার জন্য কোথায় এখন দোরে কোরে ধর্ণা দিয়ে বেড়াবে! অমূল্য বলে, নাও, নাও—আমরাই টেনে নিয়ে যাই চল। কি হয়েছে!

মেনকা আর ছোট-ননদ ক্ষেন্তি ছিল পথের ধারে। শুনিয়ে শুনিয়ে মেনকা বলে, যা ক্ষেন্তি, ছুটে গিয়ে ফ্যানের হাঁড়ি নিয়ে আয়। রাত্তির হাঁপ ধরে গিয়েছে, ঐ দেখ্—

অমূল্যর রঙটা ফর্সা; আক্রমণ তার উপর। সে বলে, বিচার ভার বৌঠানের। এত ধান আনছি, তা ক্ষুদটা-কুড়োটাও নয়—ফ্যান?

মেনকা মুখ টিপে হেসে বলে, যার যা খাবার—

কৃত্রিম ক্রোধে ধনঞ্জয়ের দিকে চেয়ে অমূল্য বলে, শোন ধনঞ্জয়-দা, বৌঠান কি বলছেন শোন একবার। আমাদের বলদ বানিয়ে

দিলেন। নাঃ—এই বসলাম ইস্তফা দিয়ে। এবারের খেপে একদিকে তুমি দাদা, আর একদিকে মুংলি—

মুংলি উঠানের ধারে জাবনা খাচ্ছিল। গোরুটা মেনকা বাপের বাড়ি থেকে এনেছে।

মুখ ঘুরিয়ে মেনকা বলে, বয়ে গেছে মুংলির! এই কড়কড়ে রোদে যাচ্ছে সে গাড়ি টানতে!

ধনঞ্জয় বলে, মুংলির মা-ই চলুক তবে। আমি রাজি। কিন্তু একলা তো গাড়ি টানা যাবে না—

ইঃ, চান করে ধোপদস্ত কাপড় পরে আছি, আমি যাচ্ছি চিত্তেবাঘ সাজতে!

ওদের দু-জনের কাদামাখা মূর্তির দিকে চেয়ে মেনকা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

এত দেমাক সহ্য হয়! ধনঞ্জয় গায়ের কাদা খানিকটা ছিটিয়ে দিল তার দিকে। বলে, যাও—আবার চান করে মরগে পটের বিবি। অমূল্য ভাই, আমরাও ঘাটে যাই চল্। আর যা আছে ওবেলা হবে।

অমূল্য বলে, ধরতে পারলে না বৌঠান, দাদা কিন্তু তোমাকেও গোরু বলে গেল।

কখন?

ঐ যে বলল মুংলির মা। যিনি গোরুর মা, তিনি কিছু আর ভটচাজ্জি নন।

আমার মুংলি কি গোরু? স্নেহ উছলে পড়ে মেনকার কণ্ঠে। বলতে লাগল, গোরুর বুঝি অত বুদ্ধি হয়! শুনবে, মুংলি আমার কি রকম বাবু? ধানের বস্তা কেটে তার জামা তৈরি করেছি, সন্ধ্যের

আগে সেই জামা পরিয়ে দিতে হবে। দেরি হলে রক্ষে নেই—কেবল শিং নাড়বে, কিছুতে জামা পিঠের ওপর রাখতে দেবে না। এমন ধারা শুনেছ কখনো ?

মাঠের কাজ বেশি বাকি ছিল না, ধানের আঁটি যা ছিল বাঁকেই বোঝাই হয়ে এল। গাড়ি টানাটানি করতে হল না। অমূল্য বলে, তা হলে এখনই বেরিয়ে পড়ি দাদা। সকালে এত পথ হেঁটে গিয়ে ইস্কুল করা—সে বড্ড কষ্ট হবে।

ছাতা-চাদর নিয়ে যে উঠানে নামল। মেনকা বলে, পৌষ-সংক্রান্তিতে এস কিন্তু ভাই। পিঠের নেমন্তন্ন রইল। দীঘির পাড়ের বাসমতী ধান আলাদা করা আছে। যা পিঠে হবে, গন্ধেই পাগল হয়ে যাবে, জিভে পড়লে একেবারে অজ্ঞান।

ভয়ানক কথা বৌঠান, পাগল হব, অজ্ঞানও হয়ে যাব? কিন্তু হাসতে গিয়ে অমূল্য হাসতে পারে না। ধনঞ্জয়ের দিকে চেয়ে বলল, আসব নাকি—ঠিক করে বল। বৌঠানের পিঠের জন্য বাসমতীর আঁটি কয়টা রেহাই দেবে তো ?

ধনঞ্জয় ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ—আসবে বই কি! নিশ্চয় আসবে। ভাবছ কেন ?

এদিক-ওদিক চেয়ে গলা নিচু করে বলল, বাসমতী তো ফুঁয়ে উড়বে। রাতারাতি আরও কত চালান হয়ে যাবে, দেখো। বিনোদ কয়ালের সঙ্গে কথা হয়ে আছে, তার ওখানে মাল জমা হবে। তাকে কিছু দক্ষিণান্ত করতে হবে—ব্যস!

উদ্বিগ্ন দৃষ্টি তুলে মেনকা জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে ?

ধনঞ্জয় জবাব দিল, হয়েছে হাতী আর ঘোড়া। বিশ্বম্ভর

পাইক ক্ষেতে এসে বলে গেল, ধানের আঁটি গুণে যাবে।· যাবে তো যাবে—কোন্ বছর না যায়? আর তাতে ক্ষেতিই বা কার কি হয়ে থাকে? হঃ—

মেনকা বলে, কবে আসবে?

ধনঞ্জয় বিরক্তভাবে বলল, পাঁজি হাতে করে তো আসেনি, বার-লগ্ন ঠিকঠাক করেনি কিছু। আসবে একদিন, আর ততদিন আমিও কিছু ঘুমিয়ে থাকব না।

অমূল্য যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়াল। রুক্ষস্বরে বলে, নিজের জিনিষ চুরি করতে লজ্জা করবে না?

ধনঞ্জয় কিছু অপ্রতিভ হয়ে বলতে লাগল, চুরি—কিসের চুরি? নিজের জমির ধান—বেচব না, বিলোব না—শুধু পেটের খোরাকিটা। চুরি অমনি বললেই হল!

নিজের জমি—মাথা উঁচু করে বলতে পার কথাটা?

ধনঞ্জয়ের বীরত্ব সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। বলে, তা সত্যি। মালিক জমিদার—মাল-খাজনা আদায় না করে সে ছাড়বে কেন? সেটাও দেখতে হবে বই কি!

অমূল্য ব্যঙ্গের সুরে বলে, মালিক! ঈশ্বরের কাছ থেকে ওরা পৃথিবীর ইজারা নিয়ে এসেছে! কিন্তু ধান তো আপনি ফলে না, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। সেই ঘামের দামটাও দেবে না কেন?

এক মুহূর্ত অমূল্য স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর মেনকার দিকে চেয়ে বলতে লাগল, কি হয়েছে জান বৌঠান? গেল-বছর তবু কিছু দিয়েছিল,—এবার সুদে-আসলে সমস্ত কেটে নিয়ে একটা চিটেও দেবে না। তাতেও শোধ যাবে না—দেনার হিসাব লাফিয়ে লাফিয়ে চলবে। তার শেষ নেই, বিরাম নেই, ওদের সর্বস্ব সঁপে দিলেও না—

মেনকা ভীতকণ্ঠে বলল, তবে কি হবে ঠাকুরপো ?

যা চিরদিন হয়ে আসছে। একদিন ঢোল বাজিয়ে বলে দেবে, ধনঞ্জয়-দার জমিতে যাওয়া বন্ধ। জমি আবার জমিদারের ঘরে ফিরবে। তিনি অবশ্য নিজে রেখে দেবেন না, অসীম দয়াময় কিনা! দয়া করে আর এক দফা সেলামির টাকা বুঝে নিয়ে নতুন একজনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করবেন।

কিন্তু সকলেরই এক দশা। নেবে কেন ?

তা নেবে। ধনঞ্জয়-দার ঐ টুকরোটার জন্য আমিই কত তদ্বির করে বেড়াব, দেখো। একটা কাক মরলে তার রোঁয়া-পাখনা নিয়ে বিশটা কাকে ছেঁড়াছেঁড়ি করে। শেষ পর্যন্ত তারাও মরে। তবু পৃথিবীতে কাকের অভাব হয় না।

অমূল্য চলে গেল। মেনকার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। ধনঞ্জয় বলে উঠল, ভয় পেলি বউ? ওর যেমন কথা! এ রকম তো হামেশাই হচ্ছে। আমি জঙ্গল হাসিল করে বাঁধ দিয়েছিলাম না? জমি নিলেই হল—হঃ!

মেনকা বলে, ঘরে যে এখনই একটা দানা নেই। ধান আসছে, তাই থেকে চাট্টি চাট্টি ছিঁড়ে খুঁড়ে ভানা হচ্ছে। সত্যি যদি উঠোন থেকে সব লুঠেপুটে নিয়ে যায়, কি হবে বল তো—

ধনঞ্জয় নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলল, তামাক সাজ্—মাথা খারাপ করিস্‌নে। তামাক খেয়ে এখনই যাচ্ছি বিনোদ কয়ালের বাড়ি। আঁটি গুণবার আগেই কতগুলো ভূতে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, দেখিস।

কিন্তু তামাক খেয়ে ধনঞ্জয় মাদুরে গড়িয়ে পড়ল।

উঃ, কি কষ্টটাই দিলি রে ভগমান! নিচে পাঁক আর জল, মাথায় চড়চড়ে রোদ—

ক্ষেন্তি বলল, ঘরে এসে শোও দাদা, বিছানা পেতে দিচ্ছি।

তা বললি ভাল। তাই শুই।

ধনঞ্জয় ঘরে ঢুকল। মেনকা বাড়ি ছিল না, জল আনতে গিয়েছিল। অনেক দূর বামুনপাড়া থেকে জল আনতে হয়। ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। দিনের মতো স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভরে গেছে। রান্নাঘরের দাওয়ায় কলসি নামিয়ে রেখে শুনতে পেল, ঘরের মধ্যে শ্যামাসঙ্গীত শুরু হয়ে গেছে—

তোর মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা দেব—

মেনকা বলে, ভাত চাপাচ্ছিস ক্ষেন্তি? তোর দাদার চাল নিসনে।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ধনঞ্জয় বলে, চাল নেবে না। কেন হয়েছেটা কি?

জ্বরের উপর ভাত খাবে?

হঃ, ধন্বন্তরী ঠাকরুণ! জ্বর হয়েছে—হাত ধরে দেখেছিস?

দেখতে হবে কেন? ঐ যে শুনছি। গান ধরেছ, আর জ্বর হয়নি।

নূতন শীত পড়েছে, জ্বর এখন ঘরে ঘরে। লোকে কাজ করে, কাদামাটি মাখে, ঘরে এসে জ্বরে কাঁপে। মেনকা ঝুড়ি-ভরতি বাঁশপাতা ও খানকয়েক বাঁশের গোড়া নিয়ে চলল গোয়ালের দিকে। সাঁজাল দিতে হবে, নইলে মশার কামড়ে সমস্ত রাত মুংলি ছটফট করবে। ঘরের মধ্য থেকে ধনঞ্জয় ডাকে, ও বউ চললি কোথা? এদিক পানে এসে শুনে যা একবারটি—

মেনকা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, কি শুনব? জ্বর না হয় তো বাইরে এস। কোথায় যে বেরুচ্ছিলে—তা শুয়ে রয়েছ কেন?

ধনঞ্জয় বলল, বেরুনো সোজা কথা কিনা! কি রকম শীত পড়েছে আজ। ঘরে বসে হুকুম ঝাড়তে সবাই পারে। হঃ—

শীত না হাতী। সবে অঘ্রাণের শুরু। আমার [illegible] তো এই এক টুকরো আঁচল—

ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, তক্কলঙ্কার, তক্ক করিসনে। আসবি কিনা তাই বল্। কাঁথা-মাদুর সব কি পুড়িয়ে খেয়েছিস? চাপা দিয়ে যা, চাপা দিয়ে যা। আমার হাড়ের মধ্যে কাঁপতে লেগেছে—

মেনকা এসে দেখে, ব্যাপার তাই বটে। কাঁথা-মাদুরে কুলায় না,—শেষে বালিশ-পাশবালিশ অবধি চাপাতে হয়। কাঁপুনি বেড়েই চলে। গানের সুরও তত চড়তে থাকে—ঘুরে ফিরে গাইতে থাকে ঐ একটা কলি—অম্বলে সম্বরা দেব। ম্যালেরিয়া জ্বরে অম্বলের উপর আকর্ষণটা অধিক হয়।

নাগরা-জুতো খটখট করে উঠল। ধনঞ্জয় চমকে উ[illegible] কান খাড়া করে।

কে?

আমি খুড়ো—আমি বিশ্বম্ভর। কাছারি থেকে আসছি।

বিশ্বম্ভর এই পাড়ারই ছেলে, কাছারির চাকরি পেয়ে এই বছর দুয়েক চাষ ছেড়েছে। পাড়ার মধ্যে এখন তার খাতির খুব! ধনঞ্জয়ের গান বন্ধ হয়ে কাতরানি শুরু হল। বলে—উহুহু—মরে যাচ্ছি বাবা, দেখসে এসে—

বাইরে এসে মেনকা বলে, তার আগে পাইক মশাই, ঐ জুতো খুলে হাতে নাও দিকি। মা লক্ষ্মীর ধান—জুতো পায়ে দিয়ে মাড়িয়ে আসছ, ওটা কি ভাল?

বিশ্বম্ভর বেকুব হয়ে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল। জুতা অবশ্য খোলে না, জমিদারের পাইক—খালি পায়ে উঠানে দাঁড়াতে ইজ্জতে

বাধে। ঘরের মধ্য থেকে ধনঞ্জয় বলল, তা দুপুর বেলায় এত কথান্তর—আবার এখন কি মনে করে বাবা ?

বিশ্বম্ভর বলে, আঁটি গুণতে এসেছি। নায়েব মশাই পাঠাল।

রাত দুপুরে ?

তাচ্ছিল্যের সুরে বিশ্বম্ভর বলে, রাত দুপুর না আরো কিছু। সবে তো সন্ধ্যে। দিব্যি চাঁদের আলো রয়েছে—

বলি, ঘর-দোর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি নাকি ? ধনঞ্জয় উত্তেজনায় বিছানার উপর উঠে বসল। বলতে লাগল, বলগে এখন হবে না, আমার এই জ্বরবিকার হয়েছে, গোণা-গাঁথা করবে কে ? হঃ—

বিশ্বম্ভর বলল, আমরাই গুণে যাব, আমরা তিনজন এসেছি। একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগল, খোদ ছোটবাবু এসে কাছারি বসেছে। যে সে নয়,—একেবারে কাঁচা-খেগো দেবতা, সাক্ষাৎ শনিঠাকুর! ও নায়েব করবে কি, আমরাই বা কি করব খুড়ো ?

টেমি জ্বেলে অনেক রাত অবধি ধানের আঁটি গোণা চ[illegible]। ধনঞ্জয় নির্জীবের মতো পড়ে আছে; জেগে আছে কি ঘুমিয়েছে বোঝা যায় না। নিশিরাত্রে নিঃশব্দ অচেতন গ্রাম। তারই মধ্যে কাছারির লোকেরা কথাবার্তা বলতে বলতে খালের সাঁকো পার হয়ে চলে গেল।

এতক্ষণে ধনঞ্জয়ের যেন সম্বিৎ হল।

গুণে গেলেন তো ভারি করলেন। আমি যদি আঁটি খুলে ফেলি! গোছা-গোছা সরিয়ে নিয়ে আবার নতুন আঁটি বেধে রাখি! কি করবি তোরা ? দাড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করে যাসনি তো! হঃ—

ধনঞ্জয়ের জর বেড়েই চলেছে; জরের উপর জর আসে। ঝাঁটি খুলবার আর ফুরসৎ হল না। এদিকে সদর থেকে জরুরি খবর এসেছে; ছোটবাবু কাল চলে যাবেন। সন্ধ্যার দিকে চা খেতে খেতে প্রসন্ন মুখে তিনি করচার পাতা উল্টাচ্ছিলেন। ধান আদায় প্রায় শেষ। কাছারির চারটে গোলা ভরতি হয়ে জায়গার অভাবে এখন পাইকদের ঘরে গাদা হচ্ছে। সকাল থেকে ভারে ভারে ধান আসে, এমনি চলে সন্ধ্যা অবধি। ধনঞ্জয়ের পাতাটায় এসে বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

এটা কি হয়েছে, নায়েব মশায়?

নায়েব বললেন, ঐ যে সেই বলছিলাম হুজুর,—মহাপ্রভু শয্যা নিয়েছেন—

বাবু কর গুণে হিসাব করতে লাগলেন, আটচল্লিশের আশ্বিন শোধ—তবে গে হল দশ। দশ-দশটা কিস্তির বকেয়া টেনে আসছেন, জমার ঘরে কালির আঁচড় নেই। বলি, বয়স হয়েছে—তাই চোখে দেখতে পান না—না, কোন রকম ইয়ে-টিয়ে আছে?

নায়েব জ্বলে উঠলেন। ইয়ে কি থাকবে মশায়? গৌরগোবিন্দ বল। বেটাদের চার পোতায় একখানা ঘর—সব এক-একটা নবাব সিরাজদ্দৌলা কিনা! একবার ঘুরে যদি পাড়াটা দেখে আসেন—

বাবু হেসে ফেললেন। আহা, চটেন কেন! সকালেও এইরকম পাঁচ-সাতটা কেস দেখালেন। চাষা-ভুষোর জর—সন্ধ্যেয় কাঁথা মুড়ি দেবে, সকালে লাঙল ঠেলতে বেরুবে। এ রকম ভুগলে তাদেরই তো যথাসর্বস্বে টান পড়বে।

নায়েবের তবু ক্ষোভ যায় নি। বলতে লাগলেন, ঐ ধনঞ্জয়ের কথাই ধরুন হুজুর, একটা গোরু আর তিনটা পাথরের বাটি। ঐ হল

তার যথা, আর ঐ হল সর্বস্ব। গৌরগোবিন্দ বল। তবে মানুষটা বড় ভাল, সেরে উঠে নিজেই দলে মলে সমস্ত ধান কাছারি তুলে দিয়ে যাবে। বরাবর দিয়েও আসছে। তাই তেমন তাড়াহুড়ো করিনে।

বাবু কঠিন স্বরে বললেন, তা এতই যখন বিবেচনা, রোগা মানুষ কবে সেরে উঠবে, কবে কি করবে—আমি বলি কি, গৌরগোবিন্দ বলে আপনারাই চলে যান--কাছারির লোক দিয়ে মলন মলুন গে। যাবার আগে আমি একটা বুঝসমজ করে যেতে চাই। আড়াই বছরের বকেয়া চলছে, ভাল কথা নয়—

একটু চুপ করে থেকে নায়েব আহ্নিক করতে উঠলেন। দু-তিনটে হেরিকেন জ্বেলে নেওয়া হল। বিশ্বম্ভর আগেই বেরিয়ে পড়েছে, এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে গোরুর যোগাড় করে নিয়ে যেতে হবে।

নায়েব গিয়ে দাঁড়াতেই বিশ্বম্ভর সভয়ে বলল, ধনঞ্জয় খুড়ো তো ওঠে না, সাড়াও দেয় না—

নায়েব বললেন, আমি ওঠাচ্ছি। ভাল চিকিচ্ছে আমি জানি। ভিরকুটি বড্ড বেড়েছে। বাবুর কাছে নাহক কতকগুলো কথা শুনতে হল।

দুমদাম করে তিনি ঘরের ভিতর উঠলেন। মেনকা মাথায় জলপটি দিচ্ছিল, তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াল। ধনঞ্জয় একেবারে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। হাতের লাঠির একটা খোঁচা দিয়ে নায়েব বললেন, ওরে হারামজাদা, মলনের যোগাড় করে দিয়ে যা আগে। তারপর চোখ উলটে থাকিস।

ধনঞ্জয় রক্তচক্ষু মেলে একবার তাকাল; কথা বলল না। কেমন অর্থহীন দৃষ্টি। অবস্থা দেখে নায়েব নরম হলেন। বললেন, আমরা মলন মলতে এসেছি বাপু। তোর মত নিয়ে আইন-মাফিক করছি কিন্তু। বুঝলি ?

ধনঞ্জয় বিড়-বিড় করে কি বলতে লাগল। নায়েব বলেন, ও ধনঞ্জয় বলছিস কি ?

চোখ মেলে অকস্মাৎ ধনঞ্জয় এক ছড়া বলে উঠল,

ঠুসি খোল ভুসি দাও—
হেসে খেলে বাড়ি যাও।

তা দেব বই কি বাবা—নিশ্চয় দেব। আমার কাছে অবিবেচনা নেই—গো-মন্থি লাগতে দেব না।

বাইরে এসে বিশ্বম্ভরকে চুপিচুপি বললেন, গতিক সুবিধের নয় রে। ভুল বকছে। বেটা মরবে নাকি ?

বিশ্বম্ভর বলে, তাহলে আজকে না হয় থাক এ সব—

বলিস কি, ওরে বেকুব! যেমন করে হোক, আজকের মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে। যদি এমন-তেমন হয়ে পড়ে—তখন ওয়ারেশ কায়েম কর, হেনো কর—তেনো কর, কত কি হাঙ্গামা! অমন বরপাত্তোর হয়ে থাকলে হবে না। জুতো খোল্—কোমর বাঁধ্—কেন পারবিনে, চাষার ছেলে তো বটে!

একটা জলচৌকি টেনে নিয়ে নায়েব দাওয়ায় চেপে বসলেন। হুঁকোটা হাতে নিয়ে বিশ্বম্ভর রান্নাঘরের দিকে চলল।

কি রাঁধছিস ও ক্ষেন্তি ? একটু আগুন দে দিকি।

ক্ষেন্তি বলে, রাঁধব কি ছাই ? উনুন ধরিয়ে হাত-পা কোলে করে বসে আছি। চাল বাড়ন্ত। ও বৌদি, ইদিকে এসো না একবার—

বিশ্বম্ভর হাঁক দিল, ছোট খুড়ী, শোন একটা কথা।

ঘোমটা নামিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে মেনকা বাইরে এল।

কি বলছ?

মোটে তিনটে গোরু পাওয়া গেছে। তোমাদেরটা গোয়াল থেকে বের করে দাও না।

মেনকা বলে, উঁহু—শীতের মধ্যে মুংলি আমার পেরে উঠবে না।

পারবে গো—খুব পারবে। পেটে খেলে পিঠে সয়। মুখ চলবে, যত খুশি পোয়াল খাবে—পারবে না কেন?

মুখে তো ঠুশি এঁটে রাখবে।

বিশ্বম্ভর বলে, না—খুলে দেব। ঐ যে নায়েব মশায় বললেন।

একটু ইতস্তত করে একটুখানি হেসে মেনকা বলল, আর আমরা? আমি আর ক্ষেন্তি? আমরা খাব না বুঝি!

বিশ্বম্ভর হেসে বলল, তোমাদেরও ঠুশি খুলতে হবে না কি?

তা এক রকম ঠুশি বই কি! উঠানে ধানের গাদা রয়েছে, আর ঘরের মধ্যে চাল বাড়ন্ত। বিশ্বম্ভরের মুখের দিকে চেয়ে আগ্রহের সুরে মেনকা জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, সমস্ত ধান কি তোমরা নিয়ে যাবে? তা হলে কি খাব? পেটের খোরাকিটাও দেবে না? ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরেই তো মানুষটির ঐ দশা—তবু দয়া হবে না?

জানে মিথ্যা, তবু বিশ্বম্ভর সান্ত্বনা দিল। অমন করে বলতে লাগলে না দিয়ে কেউ পারে না, কাছারির কর্মচারী হয়েও নয়। খোরাকি দেবে বই কি খুড়ী—আলবৎ দিয়ে যাবে, না দিলে ছাড়বে কেন? তুমি ভেব না—

আজই কিন্তু। নিদেনপক্ষে একটা খুঁচি ধান—আমরা খই ভেজে

খাব। ছেলেমানুষ ক্ষেন্তি—এত বড় রাতটা নিরম্বু থাকবে কি করে? বুঝে দেখ কথাটা—

হাসিমুখে মেনকা গোরু বের করতে গেল।

মেইকাঠের চারিদিকে গোরু ঘুরছে। পোয়ালের খসখস আওয়াজ। ধান কুড়িয়ে কুড়িয়ে স্তূপাকার করা হচ্ছে। নায়েব খুঁটি ঠেশ দিয়ে চোখ বুঁজে হুঁকো টানছেন; চোখ মেলে একবার বলে উঠলেন, গৌরগোবিন্দ বল। গোরু অত তাড়াসনে রে বিশ্বম্ভর। পায়ের নিচে পোয়াল রয়েছে, খেয়ে চাট্টি চাট্টি খেয়ে নিক। ভগবতীর শাপমন্যি কুড়িয়ে মরিসনে হতভাগা—

ক্ষেন্তি ডাকল, পাইক মশায়, বৌদি ডাকছে—তামাক-আগুন নিয়ে যাও—

নায়েব কলকেটা নামিয়ে একগাল হেসে বললেন, যা বিশ্বম্ভর, ভাল করে সেজে নিয়ে আয়। চাষাভুষো হলে কি হয়, বিবেচনা আছে।

মেনকা বেড়ার ধার অবধি এসেছিল। বিশ্বম্ভর এগিয়ে আসতে বলল, কই—আমাদের কথা বললে না নায়েব মশায়কে?

বলার সময় ফুরিয়ে যায়নি। ফাঁক বুঝে বলতে হবে তো!

মিনতির সুরে মেনকা বলে, ক্ষেন্তির বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। কাঁদছে। এইবার বলগে—দেরি কোরো না।

তামাক সেজে এনে বিশ্বম্ভর নায়েবের দিকে সযত্নে হুঁকা এগিয়ে দিল। গলা খাঁকরি দিয়ে ভূমিকা শুরু করে, ওরা বলছিল কি জানেন নায়েব মশায়? বলে, আপনার মতো দয়ার শরীর ঠাকুর-দেবতার হয়, মানুষের হয় না। খেয়ে খেয়ে গোরুগুলোর কি রকম পেট ভর্তি হয়ে গেছে—

নায়েব বললেন, বলছিল বুঝি! তা মনটা আমার বড্ড নরম। ঐ দোষেই তো মরি। বাবু কতগুলো কথা শুনিয়ে দিলেন, শুনলি তো?

গলা নামিয়ে বিশ্বম্ভর বলে, আচ্ছা। এদের খুঁচি খানেক ধান দেওয়া যায়? রুসুই-বাস একেবারে বন্ধ কি না—

নায়েবের মুখের দিকে চেয়ে কোন গতিকে সে বক্তব্য শেষ করে, মানে—আপনি বলেই বলছি নায়েব মশায়। গোরুকে এত খেতে দিলেন—মানুষে খাবে না?

না—না—না। কোথায় কে ঘাপটি মেরে রয়েছে, পাঁচ শালা গিয়ে বাবুর কান ভাঙাবে, একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তারপর অতিশয় রূঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন, নিজের কাজে যা বিশ্বম্ভর, যা বলছি—

মেনকা বেড়ায় কান পেতে নিশ্বাস রুদ্ধ করে শুনছিল; দ্রুতপদে রান্নাঘরে এসে উনুনে জল ঢেলে দিল। ক্ষেন্তি বলে, ও কি বৌদি, খই ভাজা-টাজা হবে না?

পেটে খিল মেরে শুয়ে থাক্‌গে রাক্ষুসী। তোর ভাইকে গিয়ে বল্। নিজে চোখ বুঁজে পড়ে রইল—আমি পারব না, পারব না—

তারপর উঠানে এসে—যেখানে মলন মলা হচ্ছিল—মুংলির গলা জড়িয়ে মেনকা দাঁড়াল।

ও কি হচ্ছে খুড়ী? ছেড়ে দাও—

আমার বাপের বাড়ির গোরু—কেন খাটতে যাবে? আমি গোয়ালে নিয়ে যাচ্ছি। মেনকার লজ্জা-সরম কোথায় গেছে, মাথার ঘোমটা আলগা হয়ে পড়েছে। বলতে লাগল, মুংলি তোমাদের প্রজা নয়, প্রজার গোরুও নয়—যে জুলুম চালাবে, গোলাম বানিয়ে রাখবে।

রাগ করে কি নায়েব বলতে যাচ্ছিলেন, মেনকার মুখের দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হলেন। বললেন, থাকগে বিশ্বম্ভর—ওর গোরু

খুলে দে। তুই যে তিনটে এনেছিস, ওতেই হবে। ইদিকেও তো শেষ হয়ে এল—

মুংলিকে নিয়ে মেনকা গোয়ালে চলে এল। এতক্ষণে হু-হু করে তার দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। গোরুর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তোকেও খেতে দেয় মুংলি, আমাদের দেয় না।

মুংলি নড়ে না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গোরুকে হিংসা করছে মেনকা। যদি অন্তত গোরুও হত ওরা! নির্বাক সাথীটির কাছে অনেক দুঃখ অনেক অভিযোগ জানিয়ে মেনকা শেষে ঘরে এসে শুল।

রাত অনেক হয়েছে; চাঁদ অস্ত গেছে। অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার। গোরু মৃদুমন্দ গতিতে ঘুরে চলেছে। বিশ্বম্ভর পাইক পোয়ালের উপর পড়ে নাক ডাকছে। নায়েবেরও ঘুম ধরেছে, খুঁটি ঠেশ দিয়ে জলচৌকিতে বসে বসে তিনি ঢুলছেন। একবার বেসামাল হয়ে চৌকির পাশে গড়িয়ে পড়লেন, গড়াতে গড়াতে উঠানেই যেতেন হয়তো—সামলে নিলেন। চোখ মেলে দেখেন, তাজ্জব! কালি-পড়া হেরিকেন মিটমিট করে জ্বলছিল; সেই অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল, ছায়ার মতো একটা মানুষ ধান সরাচ্ছে।

চোর, চোর!

বিশ্বম্ভর তড়াক করে লাঠি হাতে উঠে দাঁড়াল। চোর পালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বম্ভর বিদ্যুদ্বেগে গিয়ে তার মাথায় মারল এক লাঠির ঘা। আর্তনাদ করে লোকটা বসে পড়ল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। হেরিকেন কাছে নিয়ে দেখা গেল ধনঞ্জয়।

ওরে হারামজাদা, এই তোর জ্বর-বিকার? শয়তানি করে কি

ভোগটাই ভোগালি এই রাত দুপুর অবধি? নায়েব রাগের মাথায় তার পিঠে আরও ঘা কতক বসিয়ে দিলেন।

ধনঞ্জয় মাটির পুতুলের মতো সেইখানে গড়িয়ে পড়ল। ভাণ-করা অসুখ নয়, গা পুড়ে জ্বলে যাচ্ছে। বিশীর্ণ কঙ্কালসার দেহ অসাড় হয়ে পড়ে আছে। সে যে কেমন করে উঠানে এসেছিল এবং কেন যে এসেছিল—দু-বেলা যাদের সহজে ভাত জোটে, তারা বুঝবে কেমন করে? মেনকা ও ক্ষেন্তি চিৎকার করে কেঁদে উঠল। পাড়ার অনেকে ছুটে এল। বিষম ব্যাপার।

নায়েবের মুখ শুকিয়ে গেছে! একজনে নাড়ি দেখে বলে, আছে—ধুক-ধুক করছে এখনো। চাষার প্রাণ কি সহজে যায়?

নায়েব কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, বুড়ো বয়সে শেষে হাতে দড়ি পড়বে নাকি? তোরা একে কাছারি নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত কর্। আমি ডাক্তার দেখাব। সমস্ত খরচপত্র আমার—

সেই বিশ্বাসদের গোরুর গাড়ির উপর শুইয়ে ধনঞ্জয়কে কাছারি নিয়ে যাওয়া হল। ক্রোশ খানেকের মধ্যেই এক মাঝারি গোছের ডাক্তার আছেন, তিনি এলেন। ঘাড় নেড়ে তিনি রায় দিলেন, ভয় নেই বটে, তবে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ভাল। সেই ব্যবস্থা হতে লাগল। নৌকার জোগাড় হয়েছে, জোয়ার এলে রওনা হবে। সকাল বেলা একটু ভাল দেখে মেনকা ও ক্ষেন্তি কাছারি থেকে ফিরে গেল।

দুপুরে গুজব শোনা গেল, ধনঞ্জয় মারা গেছে, তাকে খালের জলে ফেলে দিয়েছে। মেনকা উন্মাদিনীর মতো আবার ছুটল কাছারি। ছোট বাবুও নৌকা করে সদরে যাবেন; খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, রওনা হবার মুখে পান চিবোচ্ছেন। এমনি সময়ে

মেনকা এসে পায়ের গোড়ায় পড়ল। বাবু মশায়, মোড়ল কোথায়? সে নাকি নেই?

রাত্রি থেকে এই সব কাণ্ড চলেছে, নায়েবের ধৈর্য রইল না। বললেন, না থাকে নেই। চোর-ছ্যাচোড়ের মরাই তো ভাল—

কে চোর?

বিস্মিত হয়ে পিছন ফিরে সকলে দেখে, টলতে টলতে ধনঞ্জয় বেরিয়ে এসেছে। চোখ লাল—যেন হিংস্র বাঘের দু'টি চোখ। বলল, চোর কে? আমি—না তোমরা?

ধর্ ধর্—বেরিয়ে এল কি করে?

পাইকেরা ছুটে এল। কিন্তু ধনঞ্জয়কে ধরে নিয়ে যায় কার সাধ্য? গায়ে যেন অসুরের বল হয়েছে। পাইকদের হাত ছিনিয়ে বলতে লাগল, চোর কেন—অমূল্য ঠিকই বলে—তোমরা সব খুনে। পিরথিমে এসেছি, মাটির উপর বসত করছি—বাতাস পাচ্ছি, বৃষ্টির জল পাচ্ছি, আর ভাতটাই পাব না?

ছোটবাবুর চোখ-মুখ উত্তপ্ত হয়েছে, অগ্নিকাণ্ড ঘটল বলে। নায়েব পাইকদের উপর গর্জন করে ওঠেন, ধরে নিয়ে যেতে পারিসনে উল্লুক বেটারা? প্রলাপ বকছে—

প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে—না? এ সমস্ত বলছে কি ধনঞ্জয়? গোরুগুলো পিটুনি খাবে, আরও ভাল করে লাঙল টানবে—এই তো হয়ে আসছে চিরদিন। কাঁধের জোয়াল ফেলে যদি সব শিঙ উঁচিয়ে দাঁড়ায়—সর্বনাশ! জগৎ তাহলে চলবে কি করে? সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে না তো আজকের জগৎ; আমরাই ঘোরাচ্ছি খুশিমতো, টুঁটি ধরে তাকে রক্ত-সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়াচ্ছি। এত মানুষের এত বড় পৃথিবী—তবু কি অসহায়!

নেতা মহিমার্ণব

উত্তর-বাংলায় যেবার বন্যা হয়, আমি আর সুশীল এক নৌকায় লোকের বাড়ি বাড়ি চাল-কাপড় বয়ে বেড়িয়েছি। সেই সূত্রে খুব মাখামাখি হল। সুশীল তখন বি. এস-সি পড়ে, আমি পড়ি আইন।

কিন্তু বছর খানেক পরে কি রকম উলট-পালট হয়ে গেল। সুশীল হঠাৎ কোথায় ডুব দিল, মোটে আর পাত্তা নেই। খোঁজ করে এক দিন তার থিয়েটার রোডের বাসায় গিয়ে শুনি, ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছে, একেবারে কলকাতাই ছেড়েছে। আমারও এই সময়টা বাবা মারা গেলেন, মা তো অনেক আগেই গেছেন, ভাইবোনগুলির সকল ভার কাঁধে চাপল, মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম। পরীক্ষা দিলাম, কিন্তু জুৎ হল না। একটা পেপারে ফেল করে অবশেষে দেশে গিয়ে উঠলাম। সেখানে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে নানা রকম গণ্ডগোল। মামলা-মোকদ্দমায় সদর-মফস্বল করে দুটো বছর কোন দিক দিয়ে কেটে গেল, টের পেলাম না।

এ-রকম বাড়ি বসেও সংসার চলে না। আবার কলকাতায় এসেছি। হ্যারিসন রোডের একটা মেসে আমার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে এক সিটে থাকি, আর চাকরির খোঁজ-খবর নিই। এমনি সময়ে শিয়ালদহের মোড়ে হঠাৎ একদিন সুশীলকে দেখলাম। বগলে এক তাড়া খাতাপত্র, হন-হন করে সে উত্তরমুখো চলেছে।

আমি উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠি, সুশীল!

সে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে।

মেসে টেনে নিয়ে এলাম। ঘণ্টা তিনেক ধরে কত কি গল্প... তারপর কাশীপুরের দিকে এক ভগ্নীপতি না কার বাড়ি চলে গেল।

আমিও তেমন চাপাচাপি করলাম না, বড়লোক—মেসে-টেসে থাকা অভ্যাস নেই ওদের, কেন মিছে কষ্ট দেওয়া!

পরদিন বারাণ্ডায় বসে দাঁতন করছি, ঘ্যাস করে একখানা ট্যাক্সি দরজার সামনে থামল। তিন সিঁড়ি এক-এক লাফে ডিঙিয়ে সুশীল উপরে এল। বলে, ঠিক হয়ে গেছে। বিকেলেই আমার সঙ্গে যাবে একগাড়িতে।

কোথায়?

জাগুলগাছি—সেখানে আমার বাড়ি। আমার স্ত্রীর নামে নতুন ইস্কুল করেছি যে—সুরমা হাইস্কুল। তুমি হবে অ্যাসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার—বুঝলে?

আমার পাশে বেঞ্চিখানার উপর সে বসে পড়ল। বলে, দেখ—ক'দিন থেকে মনটা ভাল ছিল না, এত খরচ করে একটা জিনিষ গড়তে যাচ্ছি—কে চালাবে এ-সব, তেমন মানুষ কোথায়? কাল রাত্রে—তোমরা বিশ্বাস করবে না এ-সব—কিন্তু একেবারে প্রত্যক্ষ ব্যাপার—আড়াইটে-তিনটের সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, শিয়রের ধারে বসে সে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, ভাল করে চোখ রগড়ে দেখি, সত্যিই সে—মুখের উপর সেই আঁচিলটি পর্যন্ত। বলল, অত ভাবছ কেন, আমার কাজ করবার মানুষ আমিই খুঁজে-পেতে আনব। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই তোমার সমস্ত কথা মনে এল। সকাল হতে-না-হতে তাই ছুটে এসেছি। আচ্ছা, হঠাৎ এই রকম একটা যোগাযোগ—এর মূলে অদৃশ্য শক্তি রয়েছে, তুমি বিশ্বাস কর না কি?

কিন্তু আমার দিক দিয়ে উৎসাহের লক্ষণ না দেখে সে একটু

মুসড়ে যায়। বলে, বড়বাজারে যাব এখন। তোমার কেনা-কাটার কিছু থাকে তো চল বেরিয়ে পড়ি। আজিই ধরে নিয়ে যাব—শুনব না—

একটু ইতস্তত করে বললাম, সে কি করে হয়?

হয় না? কেন হয় না শুনি? সুশীল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। বলে, ওঃ—অ্যাসিষ্টাণ্ট হতে চাও না? কিন্তু হেডমাষ্টার যে আর একজনকে করতেই হবে। এফ. এ. পাস—গ্রাজুয়েট নন, এই হুকুম নেবার জন্য আজ দু-হপ্তা কলকাতায় বসে য়ুনিভার্সিটির কর্তাদের বাড়ি বাড়ি ধর্না দিয়ে বেড়াচ্ছি। হুকুম হয়ে যাবে ঠিক। তিনি হচ্ছেন আমার ছেলেবেলার টিউটর, মাষ্টারি ছাড়া আর কোন কাজ তাঁর পছন্দ নয়, পারেনও না। আর এই বয়সে এ-ও যে কতটা পারবেন, তাতে সন্দেহ আছে। তোমার কাছে বলতে কি—ইস্কুল করছি, এর একটা উদ্দেশ্য বুড়োমানুষটার গতি করে দেওয়া।

সুশীলের পরে শ্রদ্ধায় মন ভরে গেল। কবে কোন্ শৈশব-দিনে কার কাছে পড়েছে, সেই ঋণ ভুলতে পারে নি আজও। তাড়াতাড়ি বললাম, না ভাই, তার জন্য কি? তোমার মাষ্টার মশাই—তাঁর নিচে থাকতে আমার অপমান হবে! কি যে বল তুমি—

তবে?

ওখানে যেতে মন লাগছে না। অভাব আমার খুবই আছে, তবু তোমার কাছে চাকরি করা...ধর, তোমার হয়তো কোন জরুরি দরকার হয়েছে—মুখ ফুটে হুকুম করতে পারবে না, কি রকম মুশকিল হবে ভেবে দেখ।

সুশীল হো-হো করে হেসে ওঠে, কথা শেষ করতে দেয় না। বলে, চাকরি করতে যাবে কেন? সুরমা বেঁচে নেই, তার নামটা

বাঁচিয়ে রাখবার জন্ম তুমি এত খাটবে, আমিই তো চাকর হয়ে থাকব তোমার। হুকুম-টুকুম যা করতে হয় আমাকেই কোরো, নিঃসঙ্কোচে কোরো।

বলতে বলতে তার স্বর গাঢ় হয়ে ওঠে। আমার হাত দু-খানা জড়িয়ে ধরে বলে, আমার আর কেউ নেই ভাই, বিশ্বাস কর। চাটুজ্জে মশায় হেডমাষ্টার হবেন, কিন্তু এক রকম অথর্ব মানুষ, না আছে আইডিয়া, না আছে কাজের শক্তি। সেই বন্যার সময় দেখেছি তোমার গড়ে তুলবার ক্ষমতা। ইস্কুলের ভার তোমাকেই নিতে হবে, সুরমা আমায় বলে দিয়েছে।

এর পরে আপত্তি চলে না। আর সেই সেবারও দেখেছি, সুশীলের হাত এড়ানো বড় শক্ত। সারাদিন খেটেখুটে ক্যাম্প-খাটের উপর একটু চোখ বুঁজেছি, সুশীল দুই কাঁধ ধরে সোজা দাঁড় করাত। কি না—আবার তখনই চালের পোঁটলা কাঁধে করে ছুটতে হবে; ভদ্রলোকেরা প্রায় কেউ দিনমানে সাহায্য নিতেন না, রাতের বেলা আমরা চুপি-চুপি দিয়ে আসতাম।

যাই হোক, সেদিন অবশ্য যাওয়া হল না, দিন সাতেক পরে এক অপরাহ্ণে ওদের ষ্টেশনে পৌঁছলাম। ষ্টেশন থেকেও [illegible] আট মাইল, প্রকাণ্ড মোটর অপেক্ষা করছিল। চওড়া পাকা রাস্তা। শুনলাম, সে-ও সুশীলের কীর্তি। আধ ঘণ্টা গাড়িতে ছিলাম, সুশীলের প্রশংসা ড্রাইভার লোকটার মুখে আর ধরে না।

আসুন, আসুন।

গাড়ি থামতে ছিপছিপে এক ভদ্রলোক মহা আড়ম্বরে অভ্যর্থনা করলেন। পরিচয় দিলেন, তিনি সুশীলের প্রাইভেট সেক্রেটারি।

গ্রামের সীমানায় কোনখানে একটা বাঁধ মেরামত হচ্ছে, সুশীল সেখানে গেছে। দেশনেতা—লোকে দেবতার মতো দেখে। অহোরাত্র এই সব নিয়েই সে আছে। তারপর সেক্রেটারি ডাকতে লাগলেন, চাটুজ্জে মশাই, শুনছেন? এই যে এসে গেছেন শঙ্করবাবু—

নিচু গলায় ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, রকমটা দেখুন। অথচ ঘরের মধ্যেই হাতবাক্স কোলে করে বসে রয়েছেন। এই লোক করবেন হেডমাষ্টারি—হয়েছে আর কি! বাবু হলেন একেবারে সদাশিব—আর তো মানুষ মিলল না—

ঘরে ঢুকে দেখি, মাথা-ভরা পাকাচুল গোঁফ-দাড়ি-কামানো চাটুজ্জে মশায় ঘাড় নিচু করে খস-খস শব্দে কি লিখে যাচ্ছেন। আমরা দু-দুটো লোক গিয়ে দাঁড়ালাম, তা পর্যন্ত হুঁশ নেই।

সেক্রেটারি বললেন, এত চেঁচামেচি করছি, মোটে কানেই গেল না?

চাটুজ্জে মুখ না তুলে জবাব দিলেন, কানে গেলে কি হবে, দুর্গানাম লিখছিলাম যে!

খপ করে কাগজটা তুলে সেক্রেটারি কয়েকটা লাইন পড়ে ফেললেন—

মহামহিম মহিমার্ণব হুজুরের আদেশক্রমে জানাইতেছি, আমাদের বিদ্যালয়ের পুষ্করিণী-খনন সম্পর্কে মহাশয় আগামী পরশ্ব মহিমার্ণবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাহা হইলে তৎ-প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া—

তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন।

তিন লাইনেই যে দুর্গানাম এক-শ আটবার হয়ে গেছে।

চাটুজ্জে আড়চোখে একবার আমার দিকে চাইলেন, তারপর একগাল হেসে বললেন, তা মিছে কথা কি বলুন। খাইয়ে পরিয়ে

বাঁচাচ্ছেন—ঠাকুর-দেবতা, মনিব-মহাজন যা কিছু সমস্ত তো উনি। কি বলেন মশায় ?

বুড়ার চেহারা সৌম্য গোছের, কিন্তু এই রকম চাটুকারিতায় মন খারাপ হয়ে গেল। এ লোক আণ্ডার-গ্রাজুয়েট, পেটে একটু-আধটু ইংরাজি ঢুকেছে—কথাবার্তা শুনে তো সে রকম মনে হয় না। সেক্রেটারি একবার আমার দিকে চোখ টিপে বলতে লাগলেন, দুর্গানামের ফল তো ফলে গেছে চাটুজ্জে মশায়, মিনিট কতক আপাতত মুলতুবি থাকুক না। শঙ্করবাবু শঙ্করবাবু করছিলেন, ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়ে আছেন—পা ধোবার জলটুকু পাননি।

আপনি ? সে-কথা বলেন নি কেন ? খাতাপত্র ফেলে চাটুজ্জে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনার থাকবার জায়গা হয়েছে আমার বাড়ি। একটুখানি পথ। চলুন, চলুন। হুজুর বললেন, দেখবেন কোনরকম যেন অসুবিধা না হয়। তা দেখব বই কি, প্রাণ পাত করে দেখব।

চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করি, সুশীল আপনার ছাত্র, তাকে 'আপনি' বলছেন, 'হুজুর' বলছেন—

চাটুজ্জে বললেন, হোক ছাত্র, তা বলে মানীর মর্যাদা যাবে কিসে ? সাপ ছোট হলে তার বিষ কি কিছু কম হয়, বলুন ? আমরা বেড়াল-কুকুর, ওঁদেরই এঁটোকাটা খেয়ে বেঁচে আছি। আমাদের মহিমার্ণবের মতো মানুষ এই কলিযুগে হয় না।

একতলা পরিচ্ছন্ন বাড়িখানা। বাইরের ঘরে আমার থাকবার জায়গা, পরিপাটি করে গোছানো। মন আবার প্রসন্ন হয়ে উঠল।

রাত্রে সুশীলের ওখানে একবার গেলাম। সে বলে, কেমন জায়গা হয়েছে বল। গোড়ায় ঠিক ছিল, আমার সঙ্গে থাকবে। কিন্তু চাটুজ্জে মশায় বারবার বলতে লাগলেন, তাঁর ওখানে থাকলে দু-জনে ইস্কুল সম্বন্ধে নানা রকম শলাপরামর্শ করতে পারবে, কাজকর্মের সুবিধা হবে। আমিও ভেবে দেখলাম, সে কথা ঠিক। আমার কি—আমি কেবল টাকা দিয়ে খালাস। গড়ে তুলতে হবে তোমাদেরই।

বললাম, জায়গা তো ভালই, কিন্তু তোমার যে সঙ্গ পাব না।

সুশীল হেসে উঠল। বলে, যা পাবার এমনি পাবে। এখানে থাকলে পেতে বুঝি? তা-ও ভেবেছি। আমার তো অস্থিত-পঞ্চক অবস্থা—ঠাকুর চাকরের দয়ায় বেঁচে আছি। রাতদিন দশ কাজে থাকি; কখন খেলাম কখন খেলাম না, মনেই থাকে না। ওখানে তবু দু-বেলা দু-মুঠো জুটবে, তার আর সন্দেহ নেই। কোন রকম অসুবিধা হলে তক্ষুনি জানাবে। বুঝলে?

শুয়ে শুয়ে সুশীলের কথা ভাবি। চাটুজ্জে মশায়ের কথাগুলো আর তেমন বিসদৃশ লাগে না। পাড়াগাঁয়ের সরল মানুষ, মনের কথা বলে ফেলেছেন। যা দেখে এলাম, এই রাতে এখনও সুশীল হয়তো তার বারাণ্ডার খাটিয়াখানার উপর শুয়ে শুয়ে আগামী দিনের মতলব ঠিক করছে, তার চোখে ঘুম নেই।

সকালবেলা চা-জলখাবার নিয়ে একটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। একবিন্দু আড়ষ্টতা নেই, আশ্চর্য লাগে। এসেই প্রথম কথা—

আপনার এখনো মুখও ধোওয়া হয়নি। ও, কলকাতার লোকের ন-টায় সকাল হয় যে!

চায়ের বাটিটা ঢাকা দিয়ে রেখে একটা চেয়ার টেনে সে বসে

পড়ল। আমি বললাম, কলকাতার লোকের পরে আপনার খুব উঁচু ধারণা দেখছি।

সে হেসে ফেলে। বলে, একদম জানিনে কিনা, তাই। বিশ্বাস করুন, কলকাতায় কখন একটা রাতও কাটাইনি। এই যেমন ধরুন, আপনি তো আমায় জানেন না—দেখেননি কখনো—নিশ্চয় শুনে এসেছেন, যোগেশ চাটুজ্জে মশায়ের মেয়ে নির্মলা লোক ভাল নয়। সুশীলবাবু নিশ্চয় সাবধান করে দিয়েছেন। দেননি?

আপনি লোক ভাল নন বুঝি?

নিশ্চয় নই। তার নমুনা দেখিয়ে দেব, যদি আপনি এই রকম 'আপনি' 'আপনি' করেন। চায়ের সঙ্গে লঙ্কা গুলে দিয়ে যাব, ঠোঁট ফুলে উঠবে, মুখ দিয়ে আর 'আপনি' বেরুবে না। দেখুন দিকি অন্যায়টা! আমি ছোট বোনের মতো—আপনি এত বড় পণ্ডিত মানুষ, এত বড় লেখক—

দুর্নামটা এদ্দূর অবধি এসে গেছে?

নির্মলা বলে, আসেনি? চাঁদ উঠলে কি পিদ্দিম জেলে দেখিয়ে দিতে হয়, আপনা আপনি টের পাওয়া যায়। আপনাকে এ-বাড়িতে আনল কে জানেন?

চাটুজ্জে মশায়—

বাবা বুদ্ধি করে আনবেন—তবেই হয়েছে! তাঁর ধারণা বঙ্কিমবাবুর পরে বাংলা দেশে কলম ধরেনি আর কেউ। বাবাকে পাখী পড়াবার মতো করে শিখিয়ে শিখিয়ে পাঠিয়েছি। শেষকালে সুশীলবাবুকে নিজে একখানা চিঠি লিখে পাঠালাম, তখনই তিনি রাজি হলেন।

একটুখানি চুপ করে থেকে সে বলতে লাগল, দেখুন, ছেলেবয়স

থেকে দু-বোনে বাইরে বাইরে কাটিয়েছি। জ্যেঠামশায় মারা গেলে এখানে আটকা পড়ে গেলাম। একটা কথা বলার মানুষ পাইনে। বাবা তো ঐ এক রকম। দিদি ছিল, সে লিখত-টিকত চমৎকার। সে-ও মরে গেল।

তুমি লেখ না কি ?

লিখিনে ? এই এত এত খাতা লিখে ফেলেছি। ধোপার হিসাব, মুদির হিসাব—সমস্ত। তিরিশ টাকা মাসে জমা, আশি টাকা খরচ, একপয়সাও দেনা হবে না—পারেন এ-রকম জমা-খরচ লিখতে ? আমি পারি।

খিল-খিল করে নির্মলা হেসে উঠল।

মাস-চারেক কেটে গেল। বেশ আছি। নির্মলার মাকে মা বলে ডাকি। ওঁরা খুব আদর-যত্ন করেন। এ রকম যত্ন নিজের বাড়িতে পাইনি কোন দিন। কথায় কথায় এক দিন মা বললেন, একটা কথা বলি, কিছু মনে কোরো না বাবা। তুমি যে আপনার লোক নও, এ-কথা ভাবতেই পারিনে। কিন্তু কোন্ দিন উড়ে পালাবে—

একটুখানি থেমে তিনি বলতে লাগলেন, তাই কর্তাকে বলছিলাম, একটা পাকা রকম বাঁধনে বেঁধে ফেলা যাক—পালাতে না পারে। আর আমার নির্মলাও কিছু মন্দ মেয়ে নয়—

মন্দ মেয়ে নয়, বলেন কি মা ?

মা যেন একটু চমকে গেলেন। বলতে লাগলেন, রং তেমন ফর্সা না হোক, কিন্তু কটা চামড়াই তো সব নয়—

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তর্কে কাজ কি মা, ওকে ডেকেই জিজ্ঞাসা করা যাক না। নির্মলা, এই নির্মলা—

কাছে কোনখানে ছিল, ঘরে ঢুকে বলল, কি ?

শোন, গোলমাল বেধেছে। মা বলছেন, নির্মলা দুষ্টু মেয়ে, খারাপ মেয়ে—ওকে বাড়ি থেকে বিদেয় করা যাক। আমি বলছি, তা নয়—খারাপ হবে কেন, তবে মিথ্যেবাদী। প্রথম দিনই আমায় মিথ্যে কথা বলেছে, সে ভাল লোক নয়। অথচ সাঁকোর উপর সেদিন আছাড় খেয়ে এলাম, তিন ঘণ্টা ধরে নূনের সেঁক দিল। এখনও কোন দিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হলে সমস্ত বেলা ধরে কথার সেঁক দেয়। তাই বলছি, বিদেয় যদি করেন মা, আমার বাড়িতে নিয়ে যাই। তা তুমি কি বলতে চাও, বল—

তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের হাসি নিভে গেল। সারা মুখে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। বলে, কারও বাড়ি যাব না আমি। আপনার বলে নয়, কোনোখানে না। বিদায় যদি হই, দিদির পথে যাব। ও-ই আমাদের সব চেয়ে ভাল রাস্তা।

মুখে আঁচল টেনে সে বেরিয়ে গেল। চেয়ে দেখি, মার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। এর বড় বোন বিষ খেয়ে মরেছিল।

মা বলতে লাগলেন, বিয়ে-থাওয়ার সম্বন্ধ হচ্ছিল, কিন্তু কি যে হল বাবা, এক দিন সকালে উঠে দেখি—দোর খোলা, অনিলা নেই। তারপর দেখি, উ-ই যে বকুলগাছটা দেখা যাচ্ছে, ওরই তলায় মেয়ে আমার শুয়ে রয়েছে। কি চেহারা ছিল! গায়ের রং হস্তেলের মতো, প্রাণ নেই—তা মনে হচ্ছে যেন রাজ-রাজ্যেশ্বরী ঘুমিয়ে আছে।

অনেকক্ষণ ধরে বসে রইলেন মা। কাঁদেন আর মাঝে মাঝে চোখ মুছে দু-একটা কথা বলেন। বললেন, ঐ যে ওঁকে দেখছ, উনি কি ঐ রকম ছিলেন? সেই একটা দিনে একেবারে পঞ্চাশ বচ্ছর বুড়িয়ে গেলেন।...কিন্তু মানুষ একটা বটে তোমার বন্ধু সুশীলবাবু। নিজের

পেটের ছেলে এ রকম করে না। কত জন্মের যে সুহৃৎ আমাদের, এক-শ বছর পরমায়ু হোক বাছার। সত্যি বলছি বাবা, আমার পেটের মেয়ে—কিন্তু এদের মতিগতি একবিন্দু বুঝতে পারিনে। ভাসুর-ঠাকুরের সঙ্গে মেয়ে দুটো দিল্লি-সিমলা করে বেড়াত। ইনিও তো কোনদিন ঘর-সংসারে মন দিলেন না, চিরটা কাল দশের কাজ নিয়ে এ-গ্রাম সে-গ্রাম করে বেড়ালেন। ভাবতাম, যাকগে—মেয়ে দুটো আছে তো ভাল, তা হলেই হল।

আপনার ভাসুর বড় চাকরি করতেন ?

মা বলতে লাগলেন, করলে হবে কি বাবা। মারা গেলে দেখা গেল, কিচ্ছু নেই—রাশীকৃত দেনা। অনিলা নির্মলা দেশে এল। ওমা, মেয়ে তো এক-এক রত্তি—কিন্তু অভিমান পর্বত-প্রমাণ। মেয়েমানষের এ-রকম হলে চলে ? তাই তো বুক কাঁপে, একটি চলে গেছে—ওটি কার হাতে পড়বে, কি করে বসবে। জানাশুনো ছেলে না হলে বিয়ে দেব না, মেয়ে তাতে চিরকাল আইবুড় থাকে থাকুক।

ক-দিন আর আলাপ হয়নি নির্মলার সঙ্গে। ইচ্ছে করেই করিনি। দেখা হলে পাশ কাটিয়ে যাই, কাজকর্মে বাইরে বাইরে থাকি। আর কাজের চাপও পড়েছে ভয়ানক। ইস্কুলের নূতন বিল্ডিং হয়েছে, দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে মস্ত বড় সভা হবে। দিন-রাত সেই সমস্ত আয়োজন হচ্ছে। এক দিন কিন্তু আর পারা গেল না, নির্মলা হাসতে হাসতে দু-হাত দিয়ে দরজা আটকে বলে, যেতে দেব না। যান দিকি কেমন !

না, সরো—বড্ড কাজ—

কাজ আছে তো বয়ে গেল। আপনি আমার উপর রাগ করেছেন—না ?

আমি বললাম, না, ভয় করি তোমাকে। হাসি-ঠাট্টার মধ্যে ঐ রকম আগুন হয়ে উঠলে—

নির্মলা অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, মাপ করুন।

এ-রকম করে বললে আর রাগ থাকে না, মায়া আসে। বলতে লাগল, বিয়ের কথা শুনলে আমার কি রকম মাথা খারাপ হয়ে যায়। সত্যি বলছি।

বিয়ে হয় না বলে নাকি ?

তাই যদি হয়—মিথ্যে কি ! বিয়ে হল না বলে দিদি তো বিষই খেয়ে বসল।

আমি বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালাম।

নির্মলা শান্তভাবে বলল, শুনবেন ? আমি ছাড়া কেউ জানে না। দিদি কোনদিন কিছু আমাকে গোপন করেনি, শেষের একটা কথা ছাড়া। আমি যদি বিষ খাই, কেউ কিছু জানতে পারবে না। আপনারা লিখিয়ে লোক—শুনে রাখুন, হয়তো কাজে আসবে।

আগে থেকেই সন্দেহ ছিল, অনিলার বিষ খাওয়ার মধ্যে ভালবাসা-ঘটিত কিছু আছে। ব্যাপারটা তাই। এতকাল পরে সমস্ত কথা মনে নেই—তবে শুনতে শুনতে সেই কোনদিন-না-দেখা অভাগী মেয়েটা যেন স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে বেড়াতে লাগল। গল্পটা একটু গুছিয়ে গাছিয়ে বলছি।

স্নানের জন্য ছেলেটি কলতলায় ঢুকেছে, এমন সময় টেলিগ্রাম এল—বাপের সাংঘাতিক অসুখ, শীঘ্র বাড়ি এস।

স্নান হল, খাওয়া আর হল না। দেশের ষ্টেশনে নেমে উদ্বিগ্ন ভাবে সে কোচোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে, বাবার অসুখ কেমন ?

কোচোয়ান বিহ্বলের মতো চেয়ে থাকে।

ছেলেটির চোখে জল এসে পড়ে আর কি !

খুব খারাপ নাকি ?

আজ্ঞে, বাঁধা-দীঘিতে মাছ ধরা হচ্ছে। কর্তাবাবু সকাল থেকে সেখানে।

অতএব বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা। ছেলেটি ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভাবে। বাড়ি পৌঁছে দেখে, বাপের দিবানিদ্রা তখনও শেষ হয়নি। টাক-মাথা ধবধবে পাঞ্জাবি-পরা এক প্রবীণ ভদ্রলোক বৈঠকখানায় একাকী গড়গড়া টানতে টানতে পাঁজির পাতা উল্টাচ্ছিলেন। সবিনয়ে প্রণাম করে ফরাসের এক পাশে সে বসে পড়ল।

মুখ তুলে ভদ্রলোক বললেন, তুমি কি—

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি আমাকেই দেখতে এসেছেন। তাড়াতাড়ি দেখে নিন। আমাকে আবার এক্ষুনি ফিরতে হবে, কাল একজামিন।

নির্মলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলেটি কে ?

এখানকারই।

নাম কি ?

সে আগুন হয়ে ওঠে। কি হবে পরিচয় জেনে ? আপনি তাকে জানেন না, কেউ জানে না। সে আর নেই।

নির্মলা আবার বলতে লাগল।

খানিক পরে চোখ-মুখ লাল করে ব্যাগ হাতে ছেলেটি বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় অনিলার সঙ্গে তার দেখা। অনিলা বলে, এক্ষুনি

চললে যে বড়! ভদ্রলোক এসেছেন, সন্ধ্যার পর গ্রামের আরও দশ জন আসবেন।

আসবেন, খেয়েদেয়ে ফূর্তি করে চলে যাবেন। আমার সঙ্গে পরামর্শ করে কেউ তো আসছেন না।

অনিলা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। তোমার সঙ্গে না হোক, জ্যেঠাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে আসছেন। উপযুক্ত ছেলে—বাপের মুখ উজ্জ্বল করবে বই কি! ঘরে যাও—বাহাদুরি দেখাতে হবে না।

তাড়া খেয়ে আবার সে বাড়ি ঢুকল।

সন্ধ্যাবেলা অনিলা তাদের ওখানে গিয়ে দেখে, চিলে-কুঠুরিতে চুপচাপ সে শুয়ে আছে। কোমল কণ্ঠে অনিলা ডাকল, এমন করে রয়েছ যে!

ছেলেটি অভিমানাহত ভাবে বলে, এতেও দোষ হচ্ছে? তা কি করব বল। শাঁখ বাজানো, চন্দন ঘষা, উলু দেওয়া—সে-সব কাজে তোমরাই তো সব এসেছ।

অনিলা চপল হাসি হেসে ওঠে। তুমি আজ খালি ঝগড়া করবে নাকি? এমন একটা দিন—নিচে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করবে, —তা নয়, এই রকম মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছ।

সে বিছানার উপর উঠে বসে। বলে, আমোদের দিন—না? আমার এবং তোমারও। আচ্ছা, নিচে যাই তবে—

তার ভাবভঙ্গি দেখে অনিলার ভয় করে। সে কাঁদো-কাঁদো-গলায় বলল, শোন, শুনে যাও,—কি বলছ তুমি? তোমার আর আমার...এ সব কথার মানে কি বল?

ছেলেটি স্তব্ধ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। শেষে বলল, এখনও বোঝনি? না বুঝে থাক তো বুঝিয়ে দেব এক দিন—

কি এক অঘটন ঘটবে বলে অনিলার ভয় করতে লাগল। তবু শুভক্ষণে আশীর্বাদ হয়ে গেল। বিয়ের দিন বৈশাখের ছাব্বিশে। কলেজ বন্ধ, সেই সময়টা সব দিকে সুবিধা।

গোলমাল একটা বাধল, ফাল্গুনের শেষাশেষি। মেয়ের বাপই বেঁকে বসলেন, নাঃ—কাজ নেই।

ছেলেটি ঈষ্টারের ছুটিতে আবার বাড়ি এসেছে। ছিপ-বঁড়শি নিয়ে খুব মাছ ধরে, আর ফুটবল খেলে বেড়ায়।

অনিলা বলে, কোত্থেকে কি হয়ে গেল, ভাবনাচিন্তে নেই—তুমি তো বেশ দিব্যি আছ—

থাকব না? কি বাঁচা গেছি রে অনি। শিঙে দড়ি বেঁধে গোয়ালে ঢুকিয়েছিল আর কি!

অনিলা বলে, আচ্ছা, এ-রকম কথা কোন্ শত্রু লিখে পাঠাল বল তো?

যে-ই লিখুক, কথা যখন মিথ্যে নয়—শত্রু হল কি করে?

মিথ্যে নয়? অনিলা আশ্চর্য হয়ে গেল।—বল কি, বিয়ে তোমার সত্যি হয়ে গেছে? আমরা কেউ কিছু জানতে পারলাম না—

ছেলেটি মুখ টিপে টিপে হাসে। বলে, তোমাদের চোখ কানা, কান কালা—জানবে কি করে? ঢোল-সানাই বাজবে যেদিন, সেদিনই কেবল জানতে পারবে। আমার মনে মনে বিয়ে হয়ে গেছে।

অনিলা বলে, তা হলে ঐ বেনামি চিঠি তুমি ছেড়েছ—ও ঠিক তোমার কাজ, আর কারও নয়। কিন্তু কে সে ভাগ্যবতী—বল না, বল শুনি।

দেখতে চাও?

চাই বই কি!

আজই ? এখনই ?

অনিলার বুক কাঁপতে লাগল, কথা বলতে পারে না। কেবল ঘাড় নাড়ল।

আলমারিতে লাগানো বড় আয়না—সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলে, ঐ দেখ—মুখ ফিরিয়ে দেখ চেয়ে।

অনিলা বলে, তার মানে ?

আয়নায় দেখতে পাচ্ছ না কাউকে ? তুমি কিছু বোঝ না অনি। বড্ড বোকা।

দিন দুই পরে অনিলার দেখা পাওয়া গেল জামরুলতলার কাছে। সে পুকুরঘাট থেকে ফিরছে। পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, ছেলেটি পথ আটকে দাঁড়াল।

সর।

জীবনের পথ থেকেও ?

অনিলা বলে, বড্ড তাড়া এখন। নির্মলা জ্বর থেকে উঠেছে, অন্নপথ্যি করবে।

আমারও ভয়ানক তাড়া অনিলা। বেনামি চিঠির সম্বন্ধে তুমি যা বললে বাবারও ঠিক সেই সন্দেহ। রেগে টং হয়ে আছেন। বেশ, অন্নপথ্যি হয়ে যাক—যদি বল, তার পরে এসে জিজ্ঞাসা করব।

অনিলা মুখ নিচু করে নখ খুঁটতে থাকে। বলে, কি জিজ্ঞাসা করবে, আর কি বলব। কর্তা-জ্যেঠা ঐ রকম করছেন—আমার বাবাও যখন শুনবেন সমস্ত কথা—ছি ছি ছি, কি হবে বল তো !

ছেলেটি ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, তোমার মতো অঙ্ক কষে ভালবাসা আমার নয়। বেশ, বুঝলাম। কেবল বাড়ি থেকে নয়, জগৎ থেকেই পালাতে হবে আমার।

শোন, শুনে যাও—

কিন্তু সে শুনল না, একরকম ছুটে চলে গেল। সকালবেলা শোনা গেল, ছেলেটি নিখোঁজ হয়েছে।

কলিকাতার বাসার ঠিকানা অনিলা জানত, ক-দিন পরে চিঠি পৌঁছল—কোথায় তুমি, এস—তোমার পায়ে পড়ি, ফিরে এস।

সে ফিরে এল। কিন্তু ব্যাপার তুমুল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাপ বললেন, তুমি কুপুত্র, তোমার মুখ দেখলে পাপ হয়। আমার কথা না শোন তো যা ইচ্ছে করতে পার।

সমস্ত শুনে অনিলা কান্নায় ভেঙে পড়ে। বলে, আমার মনের মধ্যে কি রকম হচ্ছে কি করে বলি তোমায়। কর্তা-জ্যেঠা যা বলেন, তাই তুমি কর।

তোমার কষ্ট হবে না ?

মেয়েমানুষের আবার কষ্ট ! আর নিতান্ত যদি অসহ্য হয়—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ছেলেটি বলতে লাগল, নদীতে জল রয়েছে, গোয়ালে গোরুর দড়ি আছে, আরও বিশ রকম উপায় আছে—এই তো ? মেয়েরা চিরকাল ঐ একটা পথ চিনে রেখেছে। আমি তা হতে দেব না। শেষ পর্যন্ত যা হয়—দুজনেরই এক গতি হবে। আমায় অবিশ্বাস কোরো না অনি, শোন আমার কথা—

অনিলা অবিশ্বাস করেনি, সেই পথের ধূলোর উপর প্রাণ ভরে তাকে প্রণাম করল।

গল্প বলতে বলতে নির্মলা হঠাৎ চুপ করে যায়। একটুখানি অপেক্ষা করে আমি জিজ্ঞাসা করি, তারপর ?

নির্মলা ম্লান হেসে বলতে লাগল, তারপর গণ্ডগোল আর বিশেষ

কিছু নয়। বোশেখ মাস পড়ল, বিয়ের দিন ঘনাতে লাগল। আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ি ভর্তি। সে বাড়িতেই আছে, এক রকম নজরবন্দি বলা যায়। ষ্টেশন কতদূরে জানেন তো! কর্তাবাবু লোকজনকে সব টিপে দিয়েছেন। দিদির সঙ্গেও দেখা হয় না বড়…একদিন কেবল হয়েছিল, খুব লুকিয়ে চুরিয়ে। কেবল এই কথাটা বলেনি আমায় দিদি—

তবে তুমি জানলে কি করে?

চিঠিতে। মেয়েমানুষের সেই চিরকেলে পথই নিল দিদি, বিষ খেল—পটাশিয়াম সাইনাইড। ও-বিষ যেখানে সেখানে মেলে না। খোঁজ—খোঁজ। চিঠি পেলাম, সে-ই চিঠি পাঠিয়েছে, আর পাঠিয়েছে বিষ। চিঠির খবর কেউ জানে না, কাউকে বলিনি। কি হবে বলে? দিদির সরল বিশ্বাসকে লোকে বলবে বোকামি। মরে গেল, তার উপর কলঙ্কের ঢাক বাজিয়ে লাভ কি?

শিউরে উঠলাম। চিঠিতে বিষ খাবার কথা বলেছিল নাকি?

নির্মলা বলল, বলেনি? আর কত কবিত্ব! আগের দিনে দেখা হয়েছিল সেই সব কথা। সময় ঠিক করে দিয়েছিল, দু-জনে এক সময়ে বিষ খাবে…এপারে মিলন হল না, ওপারে হবে। দিদি যখন বিষ খেল, সে-ও তখন বিষের শিশি হাতে জ্যোৎস্নার আলোয় ছাতের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার কাছে স্বীকার করেছে, স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

সে খেয়েছিল নাকি?

না। দরকার কি? বিয়ের দিন আসন্ন—সদরবাড়ি রসুনচৌকির ঘর উঠেছে। বিষ সে খায় নি, পাছে দুর্বল মুহূর্তে খেয়ে বসে, সেই আতঙ্কে শিশিসুদ্ধ ছাদ থেকে ফেলে দিল। একথা সে নিজের মুখে

স্বীকার করেছে। সে ভেবেছিল, দিদিও খাবে না। চিঠিতে যাই থাক, মানুষে সত্যি কি এমন করতে পারে?

আমি বললাম, স্কাউণ্ড্রেল—

না, বড়মানুষ—পুরুষ-বাচ্চা। একটা মেয়ে মরে গেল—যখন শিকারে যান, কতই তো বক-তিতির মারেন ওঁরা। কি যায় আসে?

খানিকক্ষণ গুম হয়ে থাকে নির্মলা। তারপর যখন কথা বলে যেন আর এক মানুষ, কণ্ঠস্বরে এক বিন্দু উত্তাপ নেই। বলল, বড়মানুষের পরে আমাদের ভক্তি অগাধ। দিদির ছিল, বাবার আছে, মারও আছে। দেখুন, মেয়েমানুষ হয়েছি যখন, বিয়ে করতেই হবে; কিন্তু আপনি ও-সব কথা তোলেন কি হিসাবে? আপনার কি আছে? ইস্কুলের মাষ্টার—আপনার যে বউ হবে, সে তো ধান ভেনে উপোস করে মরবে।

সে প্রগল্‌ভ হাসি হেসে উঠল।

এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে, এত সব কথার পরেও হাসতে পারে। লঘু কণ্ঠে বললাম, তা হলে নিজের কথা ছেড়ে দিয়ে কোমর বেঁধে এবার ঘটকালিতে লেগে যাই। কি বল?

নির্মলা বলে, এই তো কাজের লোকের কথা। আপনি এত স্নেহ করেন—তা এক কাজ করুন দিকি। সুশীলবাবুকে বলে কয়ে—তাঁরও তো গৃহ-শূন্য···আপনার উপকার চিরদিন আমি মনে রাখব।

আমি বললাম, চিরদিন ভুলেই থেকো নির্মলা। বরঞ্চ তার বদলে কমিশন বাবদে যদি টাকাটা-সিকেটা নগদ ধরে দিতে পার, তাতে মুনাফা বেশি।

বেশ তাই।

হাসিতে সে ফেটে পড়ল।

ইস্কুলের নূতন বিল্ডিং-এর দ্বারোদ্ঘাটন হয়ে গেল, খুবই জাঁকজমক হল। আট-দশ ক্রোশ দূর থেকে পর্যন্ত লোক এসেছে। মালার উপর মালা এত পড়েছে যে সুশীলের মুখ ঢেকে যাবার জোগাড়। লম্বা বারাণ্ডায় সুরমাদেবীর অয়েলপেন্টিং—সিঁদুরের বড় ফোঁটা-পরা ফুটফুটে তরুণী আজিকার সভাক্ষেত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রশান্ত হাসি হাসছেন। অনেকে বক্তৃতা করলেন, আমিও দু-চার কথা লিখে নিয়ে গেছি। সেটা নাকি অতি চমৎকার হয়েছিল। কি বলেছিলাম, ভাল মনে নেই। তাজমহলের উপমা দিয়েছিলাম,—আগরার তাজ পাথরে গড়া, প্রাণহীন ; আর এ হল জীবন্ত স্মৃতিমন্দির, বছরের পর বছর ছেলেরা জীবনের পাথেয় নিয়ে যাবে ঐ স্বর্গীয়ার স্মৃতিতে। এমনি কত কি কথা! খুব হাততালি পড়ল। সভাপতির টেবিলের বাঁ-দিকে মেয়েদের জায়গা, তার মধ্যে নির্মলাকেও এক নজর দেখলাম।

বাড়ি গিয়ে বললাম, শুনলে তো! কি রকম হল, বল—

নির্মলা মুখ টিপে হেসে বলে, মাইনে বেড়ে যাবে।

তার মানে? আমি খোশামুদি করেছি, তাই বলতে চাও?

নইলে এত মিথ্যে বল্লেন কি করে?

ভারি রাগ হল, রাগ করে বললাম, কোন্‌টা মিথ্যে শুনি? তুমি বিশ্বনিন্দুক, ইতর-ভদ্র সবাই প্রশংসা করল—

নির্মলা বলে, স্তুতিটা আমায় দিয়ে লিখিয়ে নিলেন না কেন। আরও ভাল হত, চাই কি সুশীলবাবু নিজেই কাঁধে তুলে নাচাতেন আপনাকে। নতুন মানুষ—ক-টা কথা বা জানেন! এক কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে লিখলে কি আর জুৎ হয়!

আঘাত করবার লোভ সামলাতে পারলাম না, বললাম, তা সত্যি। বড্ড ভুল হয়ে গেছে। তোমাকে না হোক তোমার বাবাকে দিয়ে মহিমার্ণবের ইতিহাসটা লিখিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। এতকাল ধরে সুশীল যা-যা করে এসেছে—

নির্মলা বলে, বাবার চেয়েও বেশি জানি আমি। সব চেয়ে বেশি জানত যে, সে আর নেই—

আকাশে মেঘ করেছিল, ঝুপ-ঝুপ করে এইবার বৃষ্টি এল। বিছানার উপর চেপে বসে বললাম, কি জান তুমি, বল তো।

নির্মলা ভালমানুষের মতো বলে, এবারে তো হয়েই গেল, আর তাড়া কি! আবার যখন সভা-টভা হবে, আগে থাকতে বলবেন। না হয় আমাকেই দাঁড়িয়ে দু-কথা বলতে দেবেন না! আজকাল কত, মেয়েই তো বক্তৃতা করে থাকে। নাঃ—বকে বকে আপনার মুখ শুকিয়ে গেছে, খান-দুই পাঁপর ভেজে এনে দিই আগে। দাঁড়ান—

পরদিন সকালে উঠে সভার রিপোর্ট তৈরি করতে লেগেছি। নির্মলা চা নিয়ে এসেছে আমার ঘরে। এমন সময় বলে উঠল, ঐ যে সুশীলবাবু যাচ্ছেন। ও সুশীলবাবু, শুনুন—শুনুন—আসুন না এক বার গরিবের বাড়ি।

আমিও দরজার কাছে গিয়ে ডাকলাম, এস, এস—তোমার কথাগুলো ঠিক-ঠিক লেখা হল কিনা এক বার দেখে দিয়ে যাও।

বড় ব্যস্ত যে!

একটু ইতস্তত করে সুশীল ঘরে এসে বসল।

নির্মলা বলে, চা আনি? খেয়েই বেরিয়েছেন? তা আর এক কাপ এনে দি। বিষ তো নয়—চা।

খিল-খিল করে হেসে সে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। সুশীল গম্ভীর মুখে রিপোর্ট পড়তে লাগল। চা নিয়ে এসে নির্মলা বলে, দেখুন সুশীলবাবু, আপনার কত টাকা, কত বড় বাড়ি, আমাদের আপনি কত ভালবাসেন। বাসেন না—বলুন? সেই কথা বলছিলাম দাদাকে। উনি বিশ্বাস করেন না। বলছিলাম, ঘটকালিতে লেগে যান—মোটা রকম কমিশন দেব। তা সাহস করছেন না।

রিপোর্ট ছেড়ে সুশীল তার দিকে তাকাল।

আমি তাড়া দিয়ে উঠি, কি হচ্ছে নির্মলা?

নির্মলা বলে, আপনি আর ক-দিন এসেছেন—কি-ই বা জানেন? মিথ্যে বলছি না এক বর্ণ। কি বলেন সুশীলবাবু?

নির্মলা ভিতরে গেলে বললাম, মেয়েটা আস্ত পাগল।

সুশীল কিন্তু অবাক করে দিল। বলে, আমি রাজি আছি ভাই। সম্ভব যদি হয়, চেষ্টা করে দেখ—

তুমি? এই মাস চারেক তোমার স্ত্রী গিয়েছেন। কালকে নতুন বিল্ডিং খোলা হল—

সুশীল বলে, দৃষ্টিকটু হবে, না? তা হলে দেরি হোক কিছু। এই ফাঁকে কথাবার্তা পেড়ে রাখ।

সেদিন আর নয়, পরের দিন চাটুজ্জে মশায়ের কাছে কথা তুললাম। বিস্ময়ে তিনি খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইলেন। বললেন, ঐ যে মহিমার্ণব বলে থাকি, দেখলে তো? ও সমুদ্রের শেষও নেই, তলও নেই। তা তুমি চেষ্টা কর—

চেষ্টা কোথায় করতে হবে জানি। নির্মলাকে বললাম, তোমার ঠাট্টা সুশীল কিন্তু সত্যি ভেবে নিয়েছে।

নির্মলা বলে, ঠাট্টা তো করিনি।

ঐ তোমার মনের কথা ?

নির্মলা বলতে থাকে, আমার ভাগ্যের কথা দাদা। অত বড় গাড়ি চড়তে পাব, অত বড় নাম-করা নেতার পায়ের নিচে বাঁদী হয়ে থাকব—

আমি বললাম, কেন বাজে বকছ নির্মলা, ঐ রকম যাদের মতি-গতি তুমি সে দলের নও।

নির্মলা বলে, হয়তো ছিলাম না। কিন্তু পৃথিবীতে থাকতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই। পৃথিবীর যাঁরা মালিক, আপনার আমার মতো মানুষকে তাঁরা কি সহজে থাকতে দেন ?

কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব তুলেছ তুমিই—

এবং দয়াময় তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেছেন।

আমার অসহ্য রাগ হল। বললাম, তোমায় অনুরোধ করি নির্মলা, সুশীলকে তুমি আর দশজনের মতো দেখো না। তার মতো ত্যাগী—

নির্মলা স্বরের অনুকৃতি করে বলতে লাগল, ত্যাগী মহিমার্ণব মহাযশস্বী দেশনেতা হুজুর—

হঠাৎ যেন তার কণ্ঠে আগুন ধরে গেল, বলতে লাগল, তিনি রাজি হয়েছেন, কৃতার্থ করেছেন। কেন করেছেন জানেন ? আমার কাছে সেই চিঠি রয়েছে। মৃত্যুবাণ। ঐ সেই বকুলগাছটা দাদা। দিদি যখন বিষ খেল, আপনাদের মহিমার্ণব তখন ছাদের উপর পায়চারি করছিলেন।

কি বলছ নির্মলা, তোমার গল্পের নায়ক সুশীল ? তুমি বলেছিলে, সে আর নেই।

নির্মলা বলে, নেই-ই তো। কে বিশ্বাস করবে আজ ঐ কথা ?

বলবে, কলঙ্কিনী মেয়েটা মহাপুরুষকে মজাতে চেয়েছিল—পারেনি। ...কিন্তু গল্পটার আরও শেষ আছে। সেই বিয়ে ভাঙেনি, দিনও পেছোয়নি—ছাব্বিশে বোশেখই শুভকর্ম হল। সেই বউ সুরমা। মারা গেল, এত ঐশ্বর্য ছেড়ে গেল—এমন অবিবেচনার কাজ যে কেন করল বউটা!

সে চুপ করল। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। টেনে টেনে সে ব্যঙ্গের সুরে আবার বলে, আর কি ভালবাসাই যে জন্মে গিয়েছিল ইতিমধ্যে, তার নামে দশ হাজার খরচ করে ঐ প্রকাণ্ড ইস্কুল হচ্ছে।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, ভালবাসা মানুষের মধ্যে পরেও তো জন্মাতে পারে। কি জানি!

নির্মলা বলে, মানুষের পারে, মহিমার্ণবদের নয়। সব ভালবাসা ওঁদের নিজের উপর। সুরমা মরে গিয়ে যশের সিঁড়ি বানিয়ে দিচ্ছে। আমি জানি দাদা, শা-জাহান হবেন বলেই তাজমহল গড়ছেন। সুরমা কে? দেশের নেতা এরা! মানুষেরা জেলে পচছেন, বাইরে এই রকম কত কুকুর-শিয়াল! আমি যদি বিয়ে করি, ওঁকে বাদ দিয়ে বিয়ে করব ওঁর ব্যাঙ্কের পাশ-বই গয়না-পত্র মোটরগাড়ি নেতাগিরির নাম-ডাক—এই সমস্ত। করুন না ঘটকালি।

হাসির উচ্ছ্বাস আর থামতেই চায় না।

ঘরে আগুন—

বসন্ত আর বর্ষা—দুটো মাত্র ঋতু এদের। বসন্ত অঘ্রাণে শুরু হয়ে বৈশাখ অবধি চলে। সোনালি ধানে ক্ষেত ভরতি, মাচার উপরের ডোল ভরতি। পুজো-পার্বণ বিয়ে-থাওয়ার অন্ত নেই, ঢোল-কাঁসি এবাড়ি সেবাড়ি বাজছেই। মলমলের ধুতি পরে টেরি কেটে ছোকরারা মহানন্দে কুটুম-ভাতা খেয়ে বেড়ায়।

ধানের লোভে কত রকম মানুষ এসে হাজির হয়। যাদবনাথ ডালা মাথায় অনেক দূরের গ্রাম থেকে খেয়া পার হয়ে আসে। ডালার মধ্যে রাঙা ঘুনসি, আলতাপাতা, কাঠের চিরুণি, মাথার কাঁটা ইত্যাদি প্রসাধনের শৌখিন জিনিষপত্র, আর থাকে পান-সুপারি। প্রহরখানেক বেলায় পুরুষরা ক্ষেত-খামারের কাজে বাইরে থাকে, তখন সে আসে। মেয়েরা যাদবকে লজ্জা করে না, কেউ তার মা, কেউ পিসি, কেউ ভাগনী—দীর্ঘকালের যাতায়াতে নানা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই সব আপন-জনদের কাছ থেকে যাদব পয়সা নেয় না—উঠানে ধান মলা হচ্ছে, তার খুঁচিখানেক পেলে সে বড় একগোছ পান দিয়ে যাবে। একটা পাড়া ঘুরে আসতেই ডালা ধানে বোঝাই হয়ে যায়, প্রসন্ন মুখে সে বাড়ি ফেরে।

মাঘ থেকে ক্ষেতের কাজকর্ম থাকে না, কবিগানের খুব ধুম পড়ে যায়। সন্ধ্যার পরেই খাওয়া-দাওয়া সেরে ছেলে-বুড়ো দল বেঁধে গান শুনতে বেরোয়। গুড়গুড় ঢোল বাজে, দুই দলে পাল্লা শুরু হয়, কথার মারপ্যাঁচে এ-ওকে ভূমিশায়ী করে ফেলছে, শ্রোতাদের মধ্য থেকে বাহবা বাহবা রব ওঠে। পোহাতি তারা ওঠে, তবু গান শেষ হয় না ; বেলা উঠে যায়, তবু সমানে চলছে—

আর বছর বছর এই সময়টা পণ্ডিত এসে গ্রামের ভিতর পাঠশালা বসায়। গায়ে জুৎ হবার সঙ্গে সঙ্গে চাষাদের বিদ্যাতৃষ্ণা বেড়ে ওঠে, ছেলেগুলোকে টানতে টানতে নিয়ে পাঠশালায় হাজির করে।

বিদ্যে না শিখলে চক্ষু থেকেও অন্ধ। বাড়ি বসে থেকে করবি কি রে হারামজাদারা? পড়্, লেখ্—

বুড়ো পূর্ণ গায়েন অবধি এক একদিন এসে বলে, কয়ে র-ফলাটা দেখিয়ে দাও তো পণ্ডিত। আঁকড়ে উপর-মুখো না নিচে-মুখো?

ঘাটে ব্যাপারি-নৌকার ভিড়, উত্তর-অঞ্চলের লোকেরা ধান কিনতে এসেছে। উঠানে স্তূপাকার পড়ে আছে ধানের গাদা। শোন গিয়ে, বিচিত্র সুরে মাপ করে যাচ্ছে, রামে এক—রামে দুই—রামে তিন—

ধান অফুরন্ত নয়, জ্যৈষ্ঠ পড়তে না পড়তে আউড়ির তলায় নেমে আসে। বসন্ত গেল, এবার বর্ষা। রকমারি আগন্তুকেরা পাত-তাড়ি গুটিয়ে সরে পড়ে। থাকে চাষীরা, আর রসময় চক্রবর্তী। রসময়ের এখন ধান ছড়াবার মরসুম।

পনর বছর আগে রসময় এসেছিল চাষীদের মধ্যে সুদে টাকা খাটাতে। দু-একখানা করে জমি নিতে নিতে গোটা আবাদটাই এখন তার। এই যত চাষী দেখতে পাও, সবাই তার বর্গাদার। গ্রামের একপাশে এদের পাড়া থেকে খানিকটা দূরে রসময়ের পাকা বাড়ি। বর্ষাকালে গোলার দরজা খুলে সে চাষীদের বীজধান দেয় জমিতে ছড়াবার জন্য, আর খোরাকি ধান দেয় পৌষ মাসে সুদে-আসলে দেড়গুণ ধরে দিতে হবে এই কড়ারে। ফি-বছর একটা করে নূতন গোলা বাঁধতে বাঁধতে এবারে বারোটায় দাঁড়িয়েছে। ধান সকলেই

কর্জ করে, এ একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের দিতে হয় বলে রসময় সব ধান বেচে না, হিসাব মতো কিছু গোলায় মজুত করে রাখে।

এক ছোকরা পণ্ডিত এবার পাঠশালা করতে এসেছে, নাম মুকুন্দ। সে চলে গেল না—বার মাস থাকবে, এই নাকি সঙ্কল্প। ছোকরা নিজে রান্না করে খায়, পূর্ণ গায়েনের মেয়ে ফুন্টি জল এনে বাটনা বেটে দিয়ে সাহায্য করে।

ফুন্টি বলছিল, এখন নতুন বর্ষায় ছেলেপুলেরা চারো-দোয়াড়ি পেতে মাছ ধরবে, গোরুর ঘাস কাটবে, তোমার পাঠশালা উঁকি দিয়েও কেউ দেখবে না দাদা। এখানে থেকে করবে কি?

মুকুন্দ হেসে বলে, খাব আর ঘুমুব। ব্যস—

এমন সময় ফুন্টির জেঠতুত ভাই জগন্নাথ মুখ শুকনো করে বলে, ভয়ানক কথা শুনছি পণ্ডিত, রসময় নাকি সব ধান বেচে দিচ্ছে—

মুকুন্দ বলে, শুনলি ফুন্টি? রাঁধব বাড়ব আর সালিশ করে বেড়াব এই সমস্ত নিয়ে।

ক'জন মাতব্বর জুটে রসময়ের কাছে গিয়ে পড়ল। সমস্ত ধান বেচছ, কথাটা সত্যি?

রসময় বলে, সমস্ত কেন হবে? বীজধান রেখে দেব, আর আমার নিজ সংসারে যা লাগে—

আর আমাদের? তুমি না দিলে যে না খেয়ে মরতে হবে।

রসময় বলল, ব্যবসাদার মানুষ—যাতে দু-পয়সা মুনাফা তাইতো দেখতে হবে আমাকে। এদ্দিন কর্জ দেওয়া সুবিধের ছিল, দিয়ে এসেছি। এবারে আগুনের দাম, ছ-টাকায় যা কেউ নিত না, তাই বিকোচ্ছে ষোলটাকায়। তোমাদের ধান দিয়ে কি জন্য আমি সেই পোষ অবধি হা-পিত্যেশ বসে থাকতে যাব, বল—

জগন্নাথ ফিরে এসে খবর দিল, বিস্তর বলা-কওয়ার পর রসময় শুধু আষাঢ় মাসটার খোরাকি দিতে চেয়েছে। তার বেশি কিছুতে নয়। সুবিধে পেয়েছে, ছাড়বে কেন? আর ওর ধান ও বেচবে, উপায়ই বা কি?

মুকুন্দ বলে, ধান ওর নয়—

তবে কার?

তোমাদের। ছ্যাচড়ামি করে গোলায় নিয়ে পুরেছে বই তো নয়! ওর গোলায় গচ্ছিত আছে তোমাদের জিনিষ। পাড়াসুদ্ধ খাওয়াতে হবে এখন ওকে।

জগন্নাথ বলে, তাই খাওয়াল আর কি! আস্ত কলিঠাকুর—কাদা দিয়ে মুখের ছাঁচ তুলে নিতে হয় অমন মানুষের।

মুকুন্দ নিজে চলল রসময়ের কাছারি-বাড়ি। রসময় খুব খাতির করে বসায়। শুনেছে ছোকরা খুব তেজি, আর যা-ই হোক লেখাপড়াও তো জানে খানিকটা—

খবর কি পণ্ডিত?

খাওয়া জুটছে না—

রসময় শশব্যস্ত হয়ে ওঠে। বল কি? গ্রামের অপযশ। ওরে, বাড়ির মধ্যে বলে আয়, লুচি ভেজে শিগগির একটা জায়গা করে দিক।

মুকুন্দ বলে, একদিন খেয়ে কি করব চক্রবর্তী মশায়? আমার মনিবেরা পালা করে সিধে জোগাত। কারও ঘরে চাল নেই—উপোস এখন রোজই চলবে।

মনিব? বলেছ ভাল। রসময় হা-হা করে হাসে, তা একদিনই বা কেন হবে? ওদের মধ্যে পড়ে কষ্ট কোরো না, এখানে

চলে এস। তোমার বাপমায়ের আশীর্বাদে দু-বেলা দু-মুঠো ভাত দিতে আমি কাতর নই।

জোড় হাতে নমস্কার করে মুকুন্দ হাসি-মুখে বলে, তা হলে ওদেরও কি নিয়ে আসব এখানে? দু-বেলা দু-মুঠো করে ভাত দেবেন।

একটু বিরক্ত হয়ে রসময় বলে, বারবার ওদের টেনে আনছ কেন বল তো? তোমার আর ওদের কি এক কথা হল? তুমি হলে বিদেশি ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণ, আমার স্বজাতি—

মুকুন্দ ঘাড় নেড়ে বলে, উঁহু, আপনার জাত আর আমার জাত কি এক? আমি যাদের খেয়ে বাঁচি, আপনি তাদের শুষে মারছেন। শুধু আষাঢ় মাসটার খোরাকি দিতে রাজি হয়েছেন, তার মানে যে ক-টা দিন আপনার জমিতে চাষের দরকার। চাষ ফুরোলে ওরা কি খাবে?

রসময় বলে, সেটা কি আমি বলে দেব পণ্ডিত? খাবে মুলোর ডাঁটা, খাবে ভিটের মাটি। না পারে যে চুলোয় খুশি বিদায় হয়ে যাবে। আমার কি—ধান কেটে ঘরে তুলবার মানুষ ঢের ঢের মিলবে।

ধান ওরা বেচতে দেবে না বলেছে।

রসময় অগ্নিশর্মা হয়ে বলে, বেচতে দেবেনা—ধরে রাখবে? কার ঘাড়ে ক-টা মাথা যে এমন কথা বলে?

মাথা একটাই। সেটা ঘাড়ের উপর সোজা হয়ে থাকলে সত্যি বলতে আটকায় না। আমি বলে যাচ্ছি, ওরা যখন ফাঁকি দেয়নি প্রাণপাত করে খেটে আপনার বাড়ি ধান তুলে দিয়ে গেছে—পেটে খাইয়ে ওদের বাঁচাতে আপনি বাধ্য।

রসময় বলে, ঠিক করে বল তো ছোকরা, তুমি স্বদেশি না কি? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুকুন্দর মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে বলে, হুঁ—ষোলআনা

স্বদেশির কথাবার্তা! আমরা দিব্যি সুখে-শান্তিতে ছিলাম, কে হে তুমি লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়তে উদয় হয়েছে?

বিকালবেলা ব্যাপারি আসবে ধান মেপে নিতে। গোলার চাবি হাতে রসময় ঘোরাফেরা করছে। এল না কেন? এমন কথার খেলাপ বদন ব্যাপারি তো কখনো করে না!

না, আর কোনদিন করেনি; আজই কেবল করছে দায়ে পড়ে। নৌকা নিয়ে ঠিকই আসছিল, কদমতলার বাঁকে আসা মাত্র মুকুন্দ হাঁক দিয়ে বলে, ভাল কথা বলছি তোমাকে, ফিরে যাও—

বদন আশ্চর্য হয়ে বলে, কেন—হয়েছে কি? চক্কোত্তি যে খবর পাঠিয়ে দিল—

কাদের জিনিষ বেচছে চক্রবর্তী, খবর রাখ?

কাদের?

দেখবে এস—

কৌতূহলী হয়ে বদন নেমে আসে। মুকুন্দর সঙ্গে এগিয়ে এসে দেখে, জন ত্রিশেক রাস্তায় বসে জটলা করছে।

মুকুন্দ বলে, খালি হাত-পা নয় ওদের। দেখবে?

আজ্ঞে, এসেছি যখন ভাল করেই দেখে শুনে যাই।

কেয়া-ঝাড়ের আড়াল থেকে মুকুন্দ লাঠি বের করে দেখাল। বলে, বোঝা বোঝা রয়েছে এই রকম। নতুন চাঁচা। সড়কিও আছে দু-পাঁচখানা। দেখ—

দেখে শুনে ব্যাপারি নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দেয়। নগদ টাকায় কেনাবেচা করবে, এত হাঙ্গামায় তার গরজটা কি? এখন দিনের আলো থাকতে চক্রবর্তী তো ধান গছিয়ে টাকা গুণে নেবে, তারপর

রাতের অন্ধকারে বোঝাই নৌকা নিয়ে ফিরবার মুখে ত্রিশ মরদের লাঠি-সড়কির মোহড়া নিতে কে আসবে ?

ক্রমে সমস্ত বৃত্তান্ত পৌঁছল রসময়ের কানে। শুনে সে আগুন হয়ে উঠল।

আষাঢ় অবধি খোরাকি দেব বলেছিলাম, এক চিটেও দিচ্ছিনে। খাওয়াকগে ঐ স্বদেশি পণ্ডিত। আমি নিজে সাঙড় বোঝাই করে জলমার হাটে ধান বেচে আসব। কে ঠেকাতে পারে দেখি।

মুকুন্দ জগন্নাথকে ডেকে বলে, খবর শুনেছ তো ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। কোন স্বমুন্দিকে কেয়ার করিনে। নিয়ে যাক না দেখি! ধান তো ধান—ঐ চক্কোত্তিকে শুদ্ধ গুম করে ফেলব।

পূর্ণ গায়েন বলে, কাজটা ভাল হচ্ছে না কিন্তু। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া। আর একবার গিয়ে হাতে-পায়ে ধরলে আর কিছু হয়তো দিত। এখন একেবারে বেঁকে বসেছে।

মুকুন্দ বলে, কি হয় দেখুন না—এবার চক্রবর্তী এসে এদের হাতে ধরবে। এ পক্ষ নরম হয়ে হয়েই তো বেটার গোলা অগুণতি হয়েছে। আমরা গিয়ে ঐ সাঙড় আটকাব। রাত্রে না পালায়, নজর রেখো ভাই সব।

রাত্রে পালাবার মানুষ রসময় নয়। প্রকাশ্য দিনের বেলা ঘাটে নৌকা বোঝাই হচ্ছে, আর ঢাক-ঢোল বাজাচ্ছে। চক্রবর্তীর ছেলের সেবার জ্বরবিকার হয়, জলমার কালীবাড়িতে মানত ছিল। পুজোটাও নাকি সে সেরে আসবে এই সঙ্গে।

মুকুন্দ আড়াল থেকে দেখে এল, ছইয়ের উপর বসে রসময় হুঁকো টানতে টানতে ঢুলিদের আরও জোরে বাজাতে হুকুম দিচ্ছে। অপমানে মুকুন্দর গা জ্বালা করে। তাদেরই শোনাবার জন্য ঢাক-

ঢোলের আয়োজন। পাড়ার মধ্যে এরা শাসিয়ে বেড়াচ্ছিল, রসময় মতলবটা ভেঁজেছে সে সময়। আচ্ছা!

পাগলের মতো ছুটাছুটি করে মুকুন্দ মানুষজন ডেকে বেড়ায়। কই হে, চল সব—

যাচ্ছি পণ্ডিত। এগুতে লাগ। লাঠি নিয়ে এই এক্ষুণি বেরুব। ...ও-বাড়ি যাচ্ছ কেন? আর যেতে হবে না—আমি বলে কয়ে রেখেছি। ও-বাড়ির ওরা আর আমরা একসঙ্গে যাব—

আর এক বাড়ি যেতে বলে, মেজ খোকা তো চলে গেছে। কদমতলার বাঁকে গিয়ে বসে আছে দেখগে—

মুকুন্দর পরম উৎসাহী শিষ্য জগন্নাথ বলল, মাথাটা বড্ড টনটন করছে পণ্ডিত মশায়। তা সকলে যাচ্ছে—আমি একজন না-ই যদি যেতে পারি!

দেখতে পেল, বিষ্টু মোড়ল তাকে দেখে সাঁ করে বাঁশ-ঝাড়ের দিকে সরে গেল। মুকুন্দ স্পষ্ট দেখেছে, মিছে ডাকাডাকি করে হবে কি?

কদমতলার বাঁকে—যা ভেবেছিল তাই, কাকস্য পরিবেদনা। রসময় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে এত বড় গ্রামের প্রাণ ধানগুলো নিয়ে তুলতে তুলতে সগর্বে বাঁক পার হয়ে গেল, কোন দিকে কেউ নেই। মুকুন্দ সরে আসে, লজ্জায় মুখ দেখাতে পারে না।

ত্রুটি হয়ে গেছে, সকলেই সমস্বরে স্বীকার করে, নানা রকম অজুহাত দেয়। কারো বাড়িতে মারাত্মক কাজ পড়েছিল, কেউ কুটুম্ব-বাড়ি গিয়েছিল, কারো অসুখ করেছিল, কেউ বা পৌঁছেছিল ঠিকই, কিন্তু তার দণ্ড দুই আগে রসময়ের নৌকা বেরিয়ে গেছে।

পূর্ণ বলে, কাজটা যা করেছে রসময়—অতি ইতরের কাজ।

এতগুলো লোকের মুখের অন্ন বেচে দিয়ে এল, চামারে এমনটা করে না। তবে কি জান, চক্ষুলজ্জা। বেটার চোখে চোখে পড়লেই মাথাটা আপনি নিচু হয়ে আসে।

মুকুন্দ জ্বলে ওঠে। বেশ, চোখে চোখে পড়তে না হয়, এমন যদি কিছু করা যায়—

সবাই সায় দেয়, খুব—খু-উ-ব। আমরা এক পায়ে খাড়া আছি, কি করতে হবে বল।

ক'দিন ভেবে-চিন্তে মুকুন্দ আর এক নূতন পন্থা বলে দিল। জিনিষ-পত্র বিক্রি করে চালাচ্ছ তো সকলে? চলুক ঐ রকম কয়েকটা দিন। ইতিমধ্যে বীজের নাম করে ধান বের করে নিয়ে এস রসময়ের গোলা থেকে। তারপর দল বেঁধে আবাদ ছেড়ে বেড়িয়ে পড়। যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর! বীজ-ধান খেয়ে চলবে তো এখন দিন কতক—

তারপর মৃদু হেসে মুকুন্দ গলা নামিয়ে বলে, কি ঘটবে—বলছি শোন। যখন দেখবে সত্যি সত্যি সব চাষা আবাদ ছেড়ে চলে যায়, রসময়ের জারি-জুরি ভেঙে যাবে, খোসামোদ করে সে ফিরিয়ে আনবে—চাষ নষ্ট হতে কিছুতে দেবে না। যে-ধান বেচে দিয়ে এল, জলমার হাট থেকে আবার তা-ই কিনে এনে তোমাদের খাওয়াবে। সবাই একজোট না হলে কি জব্দ করা যায় ঐ সব মানুষকে?

ঠিক কথা! ভাল বুদ্ধি হয়েছে এবার। সায় দিয়ে উজ্জলমুখে সকলে চলে গেল।

ঘটি-গাড়ু বিক্রি করে খাচ্ছে, কিন্তু চাষ ওদিকে ঠিকই চলেছে। মুকুন্দকে বলে, খাটছি কি অমনি? জমি তোয়ের না হলে এক ছটাকও বীজ-ধান দেবে না। ও হল এক নম্বর ঘুঘু, মুখের কথায় শুনবে?

ক্রোশ চারেক দূরে জঙ্গল হাসিল করে আর এক নূতন আবাদ হয়েছে। বিস্তর চাষী গিয়ে বসত করেছে সেখানে। আরও দরকার। ক'দিন হাঁটাহাঁটি করে মুকুন্দ ঠিকঠাক করে এসেছে। ওখানে গেলে ঘর বাঁধবার টাকা দেবে, আরও অনেক রকম সুবিধা করে দেবে। এবারে কৌশলটা খাটবে বলে ঠেকছে। পরামর্শ মতো একের পর এক চাষারা রসময়ের বাড়ি থেকে বীজধান মেপে নিয়ে আসছে।

মাঠের ধার দিয়ে ফিরছিল মুকুন্দ। দেখে, জগন্নাথ ক্ষেতে বীজ বুনছে।

একি হচ্ছে জগন্নাথ ?

আমি তো সব সময় তোমার সঙ্গে আছি পণ্ডিতমশাই। তা হলে কথাটা খুলেই বলি, মনের গতিক কারো ভাল নয়। জমিতে বড্ড গোন দিয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখগে, তোমার ভয়ে দিনমানে পারে না—শেষ রাত্রে উঠে সব চাষা বীজ ছড়াচ্ছে। আমি এদ্দিন চুপচাপ ছিলাম, কিন্তু সবার ক্ষেতে ফলন হবে, আমারটা খাঁ-খাঁ করবে—এটা কি রকম হয়, বিবেচনা কর।

বিষ্টুর জমিতে গিয়ে দেখে, ধান ছড়ানো হয়ে গেছে—মই দিচ্ছে।

পূর্ণর ক্ষেতে অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। বলে, শোন পণ্ডিত, তোমরা স্বদেশি মানুষ—ইটেভিটে নেই, তিন কূলে কেউ কোথাও নেই। আমাদের হল আলাদা বৃত্তান্ত। ভিটে ছাড়তে পারব না, ও বুদ্ধি দিও না। ভিটের থেকে চক্কোত্তি বেটাকে কায়দা করা যায়, এইরকম একটা-কিছু বের কর—

বিরক্ত হয়ে মুকুন্দ বলে, পা ধরে শুয়ে পড়গে। তা হলে ঠিক কায়দা হয়ে যাবে। এ ছাড়া আর উপায় দেখিনে।

পূর্ণ বলে, সে তো চিরকাল করে আসছি। তুমি এসে তবে আমাদের কি করলে বল।

জগন্নাথ বলে, কিছু না—কিছু না। বেটা পাকা শয়তান—ওকে প্যাচে ফেলতে হলে ঐ রকম আর একটা শয়তান চাই। একি ভাল লোকের কর্ম? তুমি সরে পড় দাদা। শুনলাম, থানায় হাঁটাহাঁটি করে তোমাকে অসুবিধেয় ফেলবার যোগাড় করছে।

যা বলেছে রসময়—সে লোকচরিত্র বোঝে—শুধু ভিটের মাটি খেয়েই পড়ে থাকবে এরা। ভীরুর দল। আড়ালে-আবডালে মুকুন্দর কাছে এতদিন অনেক বীরত্ব জাহির করেছে,—আবার তারই চোখের সামনে রসময়েয় পা দুটো জড়িয়ে ধরতে লজ্জা-লজ্জা করছে, তাই প্রকারান্তরে তাকে চলে যেতে বলা। কিন্তু কোনদিন কোথাও মুকুন্দ পিছু হটেনি—

যেতে হয় দল বেঁধে ডঙ্কা মেরে বেরুব, ভাই সব। একলা যাব কেন? পিছু হটে একলা পালাবার মানুষ নই আমি।

রাত দুপুরে সকলে ঘুম ভেঙে লাফিয়ে ওঠে। অগ্নিকাণ্ড! পূর্ণ গায়েনের গোয়াল-ঘর দাউ-দাউ করে জলছে। আরও পাঁচ-সাত বাড়িতে আগুন। এক-লাগোয়া খোড়ো ঘর সমস্ত—আগুন মুহূর্তে প্রচণ্ড হয়ে ওঠে, তেজি ঘোড়ার মতো এ-চাল থেকে ও-চালে লাফিয়ে পড়ছে, মড়মড় করে আড়া-খুঁটি ভাঙছে।

মেয়ে-পুরুষ কাঁথা-মাদুর নিয়ে ছুটোছুটি করে ফাঁকা মাঠের ধারে দাঁড়াল। জল ঢেলে লাভ হবে না; পুরানো চাল, ভাঙা বেড়া—বরঞ্চ সে চেষ্টা করতে গেলে অপঘাত ঘটে যেতে পারে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলে অজানা আততায়ীর উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করছে।

ছোট ছেলেমেয়েরা কলরব করে, হাততালি দেয়, ঐ ধরল আমাদের ঘরে...বনবিবিতলায় আগুন যাবে নাকি ?...বাঁশ ফুটছে শোন ফট-ফট করে, যেন গেঁটে বন্দুক...

এরই মধ্যে আলোচনাও চলছে, কে করলে এমন কাজ ? নিশ্চয় ঐ রসময় চক্রবর্তী। সর্বনেশে মানুষ—সব পারে। খবর পেয়েছে, এরা জোট বাঁধছে, তাই ঘর জ্বালিয়ে জব্দ করল।

ফুল্টি মুকুন্দর কাছে গিয়ে বলে, চক্কোত্তি নয়—তুমি—তুমি—এ ঠিক তোমার কাজ দাদা। তুমি পুড়িয়েছ—

মুকুন্দ বলে, খবরদার ! বদনাম দিসনে বলছি—

রাতে তুমি ঘুমোও না, কেবল পায়চারি করে বেড়াও। আর কেউ হলে ঠিক তুমি ধরে ফেলতে। কেন এ সর্বনাশ করলে, বল—

মুকুন্দ বলে, যে-ই পোড়াক, সর্বনাশ কি করে হল বুঝিয়ে দে দেখি। ছিল মেটে হাঁড়ি আর ছেঁড়া কাথা—সে তো বের করে এনেছিস। চালের পচা-খড় বর্ষায় আপনি খসে আসত। তা হলে জিনিষপত্তোর কি পুড়ল বল্।

কিন্তু জিনিষ না পড়ুক, ভিটে পুড়ছে—ভিটের মায়া পুড়ছে। নিজের হাতে যা পোড়ান যায় না, আততায়ী-বন্ধু নিশিরাত্রে আগুন দিয়ে তা পুড়িয়ে দিল। 'দুত্তোর' বলে এই আগুনের আলোয় বেরিয়ে পড় দেখি সব, রসময়েরা কায়দা হয়ে পায়ের নিচে এসে পড়বে।

এ কি রোমাঞ্চকর প্রত্যাশা ! সব মানুষ কোমর বেঁধেছে। হাতিয়ারের লড়াই চলেছে পৃথিবী জুড়ে। পোড়া ঘরের দিকে চেয়ে চেয়ে কি হবে ভাই ? দুঃখরাত্রির শেষে উজ্জ্বল দিনমান। নূতন পৃথিবী—তোমার আমার সকলের। চল, এগিয়ে যাই—

দুঃখ-নিশার শেষে

কালমেঘার গাছে বউল ধরেছে। পাতা দেখা যায় না। অনেক দূর বিলের মধ্যে থেকে নজর পড়ে। অপরূপ শ্রী।

মুগ কলাই পেকেছে। কলাই তুলতে ক্ষেতে গিয়ে মাদার তাজ্জব বনে গেল। দু-জন উড়ে তবলদার কুড়াল নিয়ে তৈরি। ছোটকর্তা নিজে দাঁড়িয়ে। মাদারকে দেখে তিনি বললেন, ডাবরির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল ২৮শে মাঘ। খাটা-খাটনি করবি, খাবি-দাবি…এই এক গাছের কাঠেই কুলিয়ে যাবে, কি বলিস রে মাদার ?

কোপ পড়তে লাগল গাছের গোড়ায়। চাষ করতে করতে শ্রান্ত হয়ে কতদিন এর ছায়ায় বসেছে ! আমও কি মিষ্টি !

মাদার বলে, গাছটা আমার বাপের হাতের আর্জানো ছোটকর্তা।

তা যেমন গাছ পুতেছিল, এদ্দিন ধরে খেয়েছিসও কত আম। মানা করতে গিয়েছি ?

কি হল মাদারের, ছুটে সে গাছের গোড়ায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। কুড়াল থামিয়ে তবলদারেরা বেকুবের মতো তাকায়।

ছোটকর্তা আগুন হয়ে বললেন, একটা হাঙ্গামা-হুজ্জুত না ঘটিয়ে ছাড়বিনে ? ফল খাচ্ছিস, আবার গাছটাও চাস নাকি ? নিজে তো গোমুখ্যু—পাট্টাখানা পড়িয়ে নিস একবার কাউকে দিয়ে। বেগার দিবি, আর জমির উপস্বত্ব খাবি। ঐ অবধি—ব্যস, আর কিচ্ছু নয়।

তবলদারদের চুক্তির কাজ ; সময় যাচ্ছে—তাদেরই ক্ষতি। তারা ধাক্কা দিল মাদারকে।

থর-থর কাঁপছে কালমেঘার গাছ ! মড়-মড় আওয়াজ। সর—

সরে যা তলা থেকে। গাছ ভেঙে পড়ল। তিনটে বড় ডাল ভেঙে ছিটকে এল এদিকে। পাড়ার ক'জন মেয়ে ছুটে এল, বউল নিয়ে অম্বল রাঁধবে।

এই জমি চার বিঘা ও বাস্তুভিটা বন্দোবস্ত নিয়েছিল মাদার বিশ্বাসের প্রপিতামহ মতি বিশ্বাস। চাকরান জমি—খাজনা দিতে হয় নগদ টাকায় নয়—গায়ে খেটে। বাপ-দাদারা খেটে গেছে, মাদারও এই কর্মে চুল পাকাল। ঝাঁপায় দুর্গাপিসির ছেলে গাছ থেকে পড়ে পা ভেঙেছে; যাও—খবর নিয়ে এস, কি হল তার। পূজোর সময় নৌকো নিয়ে চল বড়দলের হাটে বেসাতি করবার জন্য। নূতন পাটালি উঠেছে, কতকগুলো দিয়ে এস মেজগিন্নির বাপের বাড়ি। এই রকম মাসের মধ্যে পনেরটা দিন অন্তত মাদারের ডাক পড়বেই।

মেজগিন্নি নিজের হাতে পাটালির ধামা ভরতি করছেন। ঢালছেন তো ঢালছেনই। মাদার বলে, আমি কি মোষের গাড়ি মা ঠাকরুণ? কাঁধ ভেঙে যাবে ও-বোঝা তুলতে।

মুখে বলে এই রকম, কিন্তু মনে মনে সে নিতান্ত অখুশি নয়। পরের দায়ে কাঁধ ভাঙতে বয়ে গেছে তার। বোঝা সে হালকা করে নিতে জানে। গোড়াতেই সিকি আন্দাজ ঢেলে রেখে যাবে বাড়িতে। তারপর ভাল পুকুরঘাট দেখলেই বসে পড়বে, দু-দশখানা চিবিয়ে আঁজলা আঁজলা জল খাবে।

খুব হৈ-হল্লা চলেছে রাস্তা দিয়ে। হাটখোলায় সভা হবে, টাকা-পয়সার দরকার—নগদ টাকা কেউ বড় একটা দেয় না, ছেলেরা তাই এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে চাল আদায় করে বেড়াচ্ছে। বাড়ি বাড়ি

গিয়ে গিন্নি ও বউদের বলে এসেছে, সকলের চাল মেপে নেবার পর দু-মুঠো তুলে রেখে দিও মা, দেশের দশের নামে। দেশের কাজ হবে, অথচ কারও গায়ে লাগবে না।

সভা গেল-বছরও হয়েছিল। মোটরগাড়ি চড়ে কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক থেকে ফিটফাট বাবুরা এসেছিলেন, তাঁরা বক্তৃতা করলেন, চটাপট হাততালি পড়ল, খুব খাওয়া-দাওয়া হল তারপর। এই বা কি রকম মজা, দেখা যাক—কাজকর্ম ফেলে মাদারও গিয়ে বসেছিল সকলের সঙ্গে, হাততালি দিয়েছিল, কিন্তু বাবুরা একটা বেলা ধরে কত কি বলল প্রায় কিছুই তার মাথায় গেল না ; একটা কথা শুধু আন্দাজে বুঝল—সাহেবেরা মোটেই লোক ভাল নয়। তা না হোকগে। তারা জাত নয়, জ্ঞাত নয়, চুলোয় যাকগে তারা। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, গ্রামসুদ্ধ লোকের এই অনুষ্ঠানে ছোটকর্তার বাড়ির কেউ একটিবার চোখের দেখা দেখতে এলেন না। ছেলেরা বলতে গিয়েছিল, ওঁদের দোতলা বৈঠকখানায় বিদেশি ভদ্রলোক ক'টি রাত্রিবেলাটা শুধু শুয়ে থাকবেন। কর্তার ভাইপো সীতানাথ তাতে যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দিল। আরে মশায়, আগে দুর্গোৎসব হত এই গাঁয়ে, কত আমোদ-স্ফূর্তি! এখনকার আমলে সমস্ত উঠে গেছে। তা ছেলেরা একটু মাতামাতি করছে, তাতে এমন মারমুখি হয়ে ওঠা কেন? স্ফূর্তির বয়স, তাই করে ; ভারিক্কি হলে কি আর করতে যাবে?

এবারও আবার ঐ সভা। কিন্তু এক জিনিষ কাঁহাতক ভাল লাগে? এই পয়সায় কেষ্টযাত্রা দিলে হত। ছোটকর্তা তা হলে দশ টাকা চাঁদা দেবেন, ঠাকুরতলায় দশের মুকাবেলা তিনি বলেছেন। কিন্তু ছোকরাগুলো সে প্রস্তাব হেসেই উড়িয়ে দিল। আবার বজ্জাতি দেখ—কর্তার বাড়ির সীমানার মধ্যে তারা ঢোকে না বটে, কিন্তু

বাড়ির সামনে এসে যা চেঁচামেচি লাগায়! খুব আস্তে আস্তে চলে ঐ পথটুকু, পার হয়ে যেতে এক প্রহর লেগে যায়। সীতানাথ লম্বা বারাণ্ডাটায় সেই সময়ে দ্রুত পায়চারি করে; খাঁচার ভিতরের বাঘের মতো রেলিং-ঘেরা বাহির-বাড়িতে যেন সে গর্জাতে থাকে। মানুষটা একেবারে ক্ষেপে যায়—কেন বাপু, গরজ কি ও-রকম করবার?

ওদেরই কয়েকজন যাচ্ছিল। মাদার গাছের মাথায়—খেজুর-রস পাড়ছে। বলে, রস খেয়ে যাও খোকাবাবুরা। বড্ড খাটুনি হচ্ছে, আহা!

ছেলে তিনটি এগিয়ে খেজুর-বনে উঠল। প্রলুব্ধ চোখে তারা দাঁড়িয়েছে। মাদার ভাঁড়-ভরতি রস নিয়ে নেমে আসছে, হঠাৎ ছড়ছড় করে ঢেলে দিল সেই এক ভাঁড় রস ছেলেগুলির মাথায়। আর কি হাসি! হো—হো—হো—

টুনি দেখে হায় হায় করে উঠল। দেখ দিকি কি কাণ্ড! যাও বাবুরা, এক্ষুণি ঘরে গিয়ে চান করে ফেলগে। যত শুকোবে, তত চটচট করবে, তিষ্ঠোতে পারবে না। এক্ষুণি যাও—

বাপের সঙ্গে টুনি বচসা লাগায়, ওদের ডেকে এনে কেন নাজেহাল করলে? এত তোয়াজ কর বাবুদের তা ওদের বাড়ি গেলে মেয়েরা তো আমাদের একটু বসতেও বলে না।

মাদার বলে, সমস্ত রাত জ্বরে কুটেছে; তুই হারামজাদি বেরিয়ে এসেছিস এই সকালে? ধরলে চিঁ-চিঁ করে, ছেড়ে দিলে পাকছাট মারে।

টুনি বলে, বেরোই সাধে? মা পাঠাল। বাড়িতে কুটোগাছটি নেই বানশালে রস পড়ে থাকবে, উনুন জ্বলবে না।

কালমেঘার গাছটা নিয়ে গেছে, ডালপালা পড়ে আছে, শুকিয়ে মড়মড়ে হয়েছে ; তারই একটা ধরে টুনি টানাটানি করছে—মাদার ছুটে এসে রোগা মেয়ের চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে দূর করে দিল ক্ষেত থেকে। না—না—না, গাছটা যখন তার নয়, একটা পাতাও সে বাড়িতে নিতে দেবে না। কাঠ না থাকে তো রস পচুক।

খানিক পরে সীতানাথ হি—হি করে হাসতে হাসতে মাদারের উঠানে এল।

শুনলাম বৃত্তান্ত। বেশ করেছিস, চমৎকার করেছিস। কেমন শান্তিতে ছিলাম আমরা—খাল কেটে নোনা জল ঢোকাচ্ছে ঐ স্বদেশিশালারা।

শান্তিতে ছিল, হ্যাঁ—তা ছিল বই কি! কিন্তু আক্রোশ নিয়ে ছোঁড়াগুলোকে সত্যিই সে হেনস্তা করেনি। শান্তিভঙ্গ করেছে, অতএব বিশেষ একটা রাগ রয়েছে—সে সব কিছু নয়। যুক্তিলেশহীন বিদ্বেষ যেন জগৎসুদ্ধ মানুষের উপরে। কেন তা গুছিয়ে বলতে পারবে না ; কিন্তু চলিষ্ণু কাজকর্ম সব ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে দেখলে মাদার মনে মনে বড্ড আরাম পায়।

সীতানাথ বলছিল, খাসা করেছিস। ধরে ধরে আরও যদি ওগুলোর কান মলে দিতিস, আচ্ছা জব্দ হত।

আকাশ থেকে পড়ে মাদার। সে কি! আমি জব্দ করতে গেলাম কখন? গাছ পাড়ছিলাম, বেকায়দায় ভাঁড় উলটে ক-ফোঁটা ওঁদের গায়ে পড়েছিল। তারই ডালপালা কত গজিয়েছে দেখ। আমি আরও বললাম, পাটকাঠি ভেঙে নিয়ে এস ভাইরা। জন আষ্টেক তখন দুটো ভাঁড়ের চারিদিকে নল লাগিয়ে বসল ; মনের স্ফূর্তিতে রস খেয়ে গেল।

সীতানাথ অবাক। এসব শুনিনি তো—

নিন্দেটাই বাতাসের আগে ছড়ায় বাবু। ভাল কাজকর্ম তো পোড়া মানুষে দু-চোখে দেখতে পায় না।

সীতানাথ বলে, ছোটকাকা ডাকছেন। কুড়ুল নিয়ে আয়। সেই আমগাছটা চেলা হবে।

যাচ্ছি—

দেরি করিসনে মোটে। ছুটে আয়।

মাদার ঘাড় নাড়ে। তারপর সীতানাথ চলে গেলে রস-জ্বালানো উনুনের ধারে বসে চুপচাপ পোয়ালগুছি ঠেলে দিতে লাগল।

সারা দিন আর সময় হয়নি, সন্ধ্যার সময় অগ্নিশর্মা হয়ে ছোটকর্তা নিজে এসে উপস্থিত।

গেলিনে তুই? বড্ড বাড় বেড়েছে।

ক্যালফ্যাল করে তাকিয়ে মাদার বলে, আজ্ঞে?

সীতানাথ তোকে বলে যায় নি?

কেউ তো আসেন নি, আজ্ঞে। হাত বাড়িয়ে মাদার ছোটকর্তার পা ছুঁতে যায়। কাক-পক্ষীর মুখে খবরটা কানে এলে...দেখেছেন তো, আমি কি কখনো—

বিয়ের তারিখ এসে গেছে—এই বুধবারে। কাল না যাস তো জুতিয়ে তক্তা করব।

কিন্তু এই বলেই নিশ্চিন্ত হলেন না। আবার ভোরবেলা ছোটকর্তা নিজে এসেছেন।

পান্তা খেয়ে যাচ্ছি কর্তা। এগুতে লাগুন। কাল রাত-দুপুরে আবার বড্ড জ্বর এসেছে টুনির। সারারাত হাঁসফাঁস করেছে। এখনও কমতি নেই।

মানকচুর পাতা রোগীর মাথায় নিচে দিয়ে মাদার জলের ধারানি করছে, বউ জল এনে দিচ্ছে পুকুরঘাট থেকে।

ছোটকর্তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। বললেন, হয়েছে—হয়েছে। আর সব ও-ই করতে পারবে। নাড়ু-কোটা আজকে। যজ্ঞি নষ্ট করবি নাকি হারামজাদা ?

কুড়ুলের আছাড় ভেঙে গেছে। নতুন আছাড় লাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কর্তা—

আমার কুড়ুল আছে। চলে আয়—

এর আগে টুনি খুব কাতরাচ্ছিল, ছোটকর্তা এলে চুপ হয়ে ছিল। সে কিসকিস করে বলে, যাচ্ছ বাবা, চাট্টি নাড়ু নিয়ে এস বিয়েবাড়ি থেকে—

মাদারকে সঙ্গে নিয়ে তবে ছোটকর্তা নড়লেন।

রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে মেয়েরা তারপর নাড়ু কুটতে যাবেন। খাওয়া-দাওয়া তাই একটু সকাল সকাল হচ্ছে। সবাই ভিতর-বাড়িতে। ঠক-ঠক-ঠক—আওয়াজ আসছে লিচুতলার দিক থেকে। জনমজুরেরা খাটছে। দিবানিদ্রার আগে ছোটকর্তা এসে এদের স্নানের তেল দেবার ব্যবস্থা করবেন। তখন ছুটি।

চাটুজ্জে-বাড়ি ডাবরির নেমন্তন্ন। গায়ে-হলুদ হয়ে গেছে, আত্মীয়-কুটুম্ব জ্ঞাত-গোষ্ঠি সকলে কাপড়চোপড় দিচ্ছে, খাওয়াচ্ছে। সেজে গুজে ডাবরি চলেছে। যাওয়া হল না, ছুটতে ছুটতে সে ফিরে এল। চোখ-মুখ নাচিয়ে বলে, তোমার মাদার বিশ্বাস কি রকম কাজ করছে, দেখসে একবার রাঙা-দা—

মুখ তুলে ছোটকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে ?

চোখ বুঁজে হুঁকো টানছে, আর বসে বসে কুড়ুলের উল্টা পিঠ দিয়ে কাঠে ঘা মারছে। শব্দ শুনে তোমরা ভাবছ, ভয়ঙ্কর খাটছে।

খাওয়া হল না সীতানাথের, এঁটো হাতে ছুটল। সন্ত্রস্ত ছোটকর্তা বললেন, মারাধার করিসনে কিন্তু। বুড়োমানুষ—

হুঁ, মানুষ না আরো কিছু—

সামনাসামনি এসে সীতানাথ রাগের চোটে পায়ের চটি খুলে নিল। গতিক বুঝে মাদারও পালাচ্ছে। উচ্ছিষ্ট এঁটোকাঁটা কেলা হয় এক জায়গায়, সেখানে দাঁড়িয়ে মাদার চেঁচাতে লাগল, নোংরা জায়গা—এখানে এলে নাইতে হবে রাঙাবাবু। যেন নিরাপদ দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে, এই রকম ভাব।

থমকে দাঁড়াল সীতানাথ। ঠিক কথা। আর এগুল না, জুতো ছুঁড়ে মারল। মাদার পাশ কাটিয়ে বেঁচে গেল তো তখন চেলা-কাঠের টুকরো। একের পর এক ছুঁড়ছে। একখানা সজোরে গিয়ে লাগল মাদারের পায়ে। আর্তনাদ করে সে বসে পড়ল। শাস্তি দিয়ে সীতানাথ খুশি মনে ফিরে যায়।

অনেকখানি কেটে গেছে, রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আঙুল দিয়ে রক্তটা মুছে মাদার হুঁকো-কলকে হাতে নিল। রক্ত বন্ধ হয়নি, গোছার উপর দিয়ে গুড়িয়ে পড়ছে। ডাবরির কষ্ট হচ্ছে এখন। দুত্তোর—কেন সে লাগাতে গেল রাঙা-দার কাছে? রাঙা-দারও বাড়াবাড়ি সব ব্যাপারে। ডাবরি ফিরে ফিরে দেখে। মাদার যাচ্ছে, আবার থেমে দাঁড়াচ্ছে রক্ত মুছবার জন্য। কাটা জায়গায় ধুলো চেপে দিচ্ছে সে।

ডাবরি এসে বলে, ও-সব দিও না, খারাপ হতে পারে। আচ্ছা, রুমাল দিয়ে বেঁধে দাও দিকি ওখানটায়। বাড়ি গিয়ে বেশ করে ধায়

দুব্বোঘাস চিবিয়ে লাগিয়ে দিও। ভাবরি যেন এইভাবে দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করল। মোলায়েম রেশমি রুমাল। হাতে নিয়ে মাদার কেবলি পাকায়। ও-জিনিষ পায়ে বাঁধতে মায়া হচ্ছে···কেমন খোশ-বু ছাড়ছে। কেন যে মানুষে ঐ সব কিনে পয়সা নষ্ট করে, চারিদিকে গন্ধ ছড়িয়ে কি যে লাভ হয় ওদের!

নারিকেল-পাতায় ভিয়েন-ঘর ছাওয়া হচ্ছিল, সেখানকার জনেরা নেমে এসে জিজ্ঞাসা করে, হয়েছে কি রে মাদার

কুড়ুল এসে লেগেছে। বেশি লাগেনি।

ভাগ্যিস—

কিন্তু ছোটকর্তা এসে ফাঁস করে দিলেন। বললেন, এমন গোঁয়ার হয়েছে সীতেটা—ঠিক একদিন জেলে যাবে এই করে। বাড়িতে শুভ-কাজ, আর বয়সেও মাদার তো ওর তেদুনো হবে···অবেলায় শুকনো মুখে বাড়ি যাসনে বাবা, দুটো খেয়ে যাস।

একা মাদাম নয়, আরও চারজন ছিল—সকলের জন্য ভাত চাপান হল।

চৈতন মোড়ল গালি দেয়, তুমি কি রকম মাদার? চ্যাংড়া ছোড়া মেরে গেল, মুখ বুজে মার খেলে? চেঁচামেচি হলে আমরা গিয়ে পড়তাম।

মাদার ঘাড় নেড়ে বলে, হুঁ—মারবে। মগের মুল্লুক কিনা! রক্ত পড়ছিল, এই দেখ কর্তার মেয়ে খাতির করে রুমাল দিয়ে গেছে পায়ে বাঁধবার জন্য।

আবার দোষ ঢাক ওদের? মার খেয়ে কুকুরও ঘেউ-ঘেউ করে। মাদার, তুমি কুকুরের অধম।

মাদার জবাব দেয় না। কিন্তু মনে মনে ভাবে, সত্যিই তো,

কুকুর ছাড়া আর কি? ঐ রাঙাবাবুর জন্ম হল—মনে হয়, একেবারে সেদিনের কথা। সে বড় হয়েছে, মারতে শিখেছে, ঠিক যেমন ঐ রাঙাবাবুরই বাবা কতদিন মেরেছে তাকে। বাঘের বাচ্ছা বাঘ হয়েছে—তা হবেই তো!

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা। উঠানে পা দিতে বউ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তবু ভাল যে ফিরলে! জ্বরের উপর জ্বর এসেছে মেয়েটার। তাড়সে ভুল বকছে।

কই? কোথায়? আসি কি করে? কর্তা শিবতুল্য লোক, ছাড়ল না। বলে, এত খেটেছিস—খেয়ে যা। বড়লোকের বিস্তর অয়োজন, খেতে খেতে বেলা কাবার—

খাওয়ার কথায় সম্বিৎ হল টুনির। অস্ফুট কণ্ঠে বলে, আমার নাড়ু?

বউ বলে, ও বেলার খই পড়ে রয়েছে। কিছুতে দাঁতে কাটল না। নাড়ু খাব, নাড়ু খাব…পাগল করে তুলেছে একেবারে।

মাদার পায়ে পায়ে আবার চলল বাবুদের বাড়ি। সকালে কলকাতা থেকে অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষ এসেছেন, নানান জিনিষপত্র এনেছেন…একঝুড়ি কমলালেবু এসেছে, মাদার দেখেছে। নাড়ু নয়—দু-একটা নেবু যদি চেয়ে চিন্তে আনা যায় ডাবরির কাছ থেকে। চাইলে সে ঠিক দিয়ে দেবে। সেই দুপুর থেকে ডাবরি যেন আর একরকম হয়ে গেছে, এত লোক থাকতে নিজে ভাত-তরকারি পরিবেষণ করল; যখন কাছে এসেছে, দুটো একটা ভাল কথা বলেছে, কিম্বা হেসেছে। রোগা মেয়ের নাম করে চাইলে ঠিক সে দিয়ে দেবে।

এখন এই রাত্রিবেলা মাদার অবাক হয়ে গেল ও-বাড়ি গিয়ে।

পাম্প আলো জ্বলছে, চারিদিক আলো-আলো ময়। ডাবরিকে এমন সাজিয়েছে সেই কলকাতার মেয়েগুলি, উজ্জ্বল আলোকে ঠিক পরীর মতো দেখাচ্ছে। এই যে সে ডাবরি, চেনা মুশকিল। গান গাইছে। কি চমৎকার! পিছনে বারাণ্ডায় মিটিমিটি হেরিকেন জ্বলছে। সেখানে এসে অনেকক্ষণ ধরে মাদার গান শুনল! আগন্তুকদের রূপ, ঐশ্বর্য, মিষ্টহাসি, গানবাজনা—এর জন্য মনে মনে সে-ও গৌরব অনুভব করে। ছোটকর্তার বাড়ির কুটুম্ব তারও যেন আপনার লোক।

আসর ভেঙে মেয়েরা এবার রান্নাঘরের দিকে চলল। ডাবরি বলে, হেরিকেন নিয়ে কি করছ মাদার?

থতমত খেয়ে মাদার বলে, দপ-দপ করছিল। কাচ ভেঙে যাবে. তাই নিভিয়ে রাখছি।

কমলালেবুর কথা তোলার ফুরসৎ হল না, নেভানো-হেরিকেন হাতে নিয়ে সে নেমে পড়ল।

টুনি আঁতকে আঁতকে উঠছে। মাদার বউকে বলল, আলো ধরা দিকি—অমন করে কেন? বাবুর বাড়ি অনেক আলো। তাই বলল, তোর মেয়ের অসুখ মাদার, নিয়ে যা একটা। কালকে রাত্রে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠছিল, আঁধারের মধ্যে তখন যে কি ভয় ভরছিল বউ—

ঘরের মধ্যে আলো আনতে টুনি চোখ মেলল। টকটকে লাল চোখে অর্থহীনভাবে সে তাকাচ্ছে।

খুব জাঁকজমকে ডাবরির বিয়ে হয়ে গেল। মাদারের যাওয়া হয়নি। সদ্য মেয়ে মরেছে, বিয়ে দেখতে গেলে লোকে বলবে কি? টুনির কথা বড্ড মনে আসে, আর ক-বছর পরে তারও বিয়ে দিতে হত!

ছোট কর্তা হঠাৎ এলেন একদিন। মাদার পিঁড়ি এগিয়ে দিল।

শুনেছ মাদার, পুলিশ হাটখোলায় মিটিং করতে দিল না দাঙ্গাহাঙ্গামা হতে পারে বলে। তুমি কলাই তুলে এনেছ, ঐ ক্ষেতে সভা করবে শুনছি। তোমায় কিছু বলেছে?

কিচ্ছু না—

আস্পর্ধা দেখ। বুকে বসে দাড়ি তোলা একে বলে। গভর্ণমেণ্টকে গালি দেয়, তারা কিচ্ছু করে না দেখে বুকের পাটা বেড়ে গেছে হারামজাদাগুলোর।

মাদার বলে, গরমেণ্টো থাকে কলকাতা শহরে, শুনতে আসে না। কিন্তু আমাদেরই চোখের উপরে—

বলতে বলতে খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আসুক না জমিতে। দেখে নেব, কত ধানে কত চাল।

পরের দিন সীতানাথ এসে ডাকল, থানায় চল্ মাদার। আমি যাচ্ছি। তোর আর আমাদের দুই তরফ থেকেই আপত্তি জানিতে আসি।

থানা-পুলিশ লাগবে না রাঙাবাবু। এই হাত দুটো রয়েছে কি করতে?

দাওয়া থেকে মাদারকে কিছুতেই নামান গেল না।

সভার দিন সকালবেলা সীতানাথ আবার এসেছে।

একেবারে দুপুর থেকেই তুই গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি মাদার। আমরা পিছনে রয়েছি, পুলিশ আছে, ভয় কি?

মাদার বলে, একটা মেয়ে ছিল—মরেছে। ভয় আর কারে করব রাঙাবাবু? পিছন চেয়েও আর কখনো কিছু করবে না মাদার বিশ্বাস। জমি তো তুলে নিয়ে যাচ্ছে না, খানিকক্ষণ গলাবাজি করে

চলে যাবে। কাজ নেই আমার ও-সব হাঙ্গামে। দুপুরবেলাটা আমি ঘুমব।

অনেকক্ষণ ধরে অনেক জপাল সীতানাথ। মাদার কেবলি ঘাড় নাড়ে। মুখ চুণ করে সীতানাথ ফিরে গেল।

বাড়ির সামনে দিয়ে মিছিল চলেছে। দাওয়ায় বসে বসে মাদার টিপ্পনী কাটছে—ওরা যা বলে ভেঙচায়। হঠাৎ সে লাফ দিয়ে পড়ল উঠানে। একটা হুড়কোর বাঁশ হাতে নিল।

সভয়ে বউ বলে, চললে কোথা? এই যে রাঙাবাবুকে বলে দিলে, যাবে না।

ওরা তু-উ-উ করবে আর যাব—কুকুর নাকি? আমার জায়গা-জমি রক্ষে করতে চললাম আমি।

মিছিল চলেছে। দূরে দূরে ক্রুদ্ধ চোখে চলেছে মাদার বিশ্বাস—বাবুদের কথায় নয়, নিজের জমি রক্ষা করতে।

একজন বলে, আলাদা হয়ে যাচ্ছ কেন? ইদিকে এসো দাদা। লাইনে এসে এক হয়ে চল সকলের সঙ্গে।

মাদার বলে, কেনা-গোলাম নই তো মশায়। রাস্তা কারও বাপের জমি নয়। যেখান দিয়ে যে রকম খুশি চলব, তোমাদের কি তাতে?

সভাপতির সামনে গিয়ে মাদার বলে, আমার জমিতে জমায়েত হয়েছ কেন তোমরা? কার হুকুম মতো?

কাজ তো তোমারও—

আমার কাজ আমি বুঝব। তোমাদেরটা তোমরা ভাবগে—

আমাদের সকলের ভাবনাই যে এক ভাই!

মাদার চোখ গরম করে। সভাপতি বলেন, আচ্ছা কি বলতে চাও তুমি, বল। ঐ দিকে মুখ করে বল। সবাই শুনে উচিত মনে করে তো চলে যাবে। তোমার সঙ্গে ঝগড়া আমরা কেউ করব না।

রোখ মতো মাদার ফিরে দাঁড়াল। কিসের পরোয়া? খুব শক্ত শক্ত কথা শুনিয়ে দেবে। সভাপতি বললেন, এই গ্রামের প্রবীণ কৃষক মাদার বিশ্বাস আপনাদের দু-এক কথা বলতে চান—

শত শত চোখ তার দিকে ফেরানো। সে বলবে, সবাই শুনবে বলে প্রতীক্ষা করছে। অসহায়ের মতো মাদার চারিদিকে তাকায়। যেন জলে পড়েছে; পঞ্চান্ন বছর বয়স হয়েছে, তার কোন কথা কেউ শোনে নি, সে-ও বলতে যায়নি কাউকে। ভয় করছে, তবু কি রকম একটা আনন্দও লাগছে। বলে, আমার জমির উপর সকলে এসে হল্লা করছ—

ভিড়ের মধ্যে চৈতন। বলে, ওরে আমার জামদার রে! গাছ কেটে ফেলল, সেদিন জমিটা ছিল কার? এ-সব কিচ্ছু তোমার ন মাদার ভাই।

বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে মাদারের। ঠিক কথা, অত্যন্ত খাঁটি কথা, সংসারের কোন কিছুই তার নয়।

বলে, কালমেঘার গাছ পুঁতেছিল আমার বাবা। ভাবতাম আমার জিনিষ। ছোটকর্তা কেটে নিল গাছটা। মেয়েটা ছিল, কত যত্ন করত, উঠোনে পা দিতে না দিতে ছুটে আসত। ভগমান তাকে নিয়ে নিল। ও বাপু, পিরথিমে দেখছি সব বেটা শয়তান। শুধু মানুষ কেন, পিরথিমের মালিক ভগমান সুদ্ধ শয়তান।

কি বলছে আবোল-তাবোল। সময় নষ্ট। অনেক জরুরি প্রস্তাব

গ্রহণ করতে হবে। তোফা তোফা বক্তৃতা হবে। বক্তার
দেখছেন, মুখ চুলকাচ্ছে—অধীর হয়ে উঠছেন। কিন্তু
মাদার বিশ্বাস। বলছে, টুনি মরে গেল; ভগমান কেে
যার পথ, ছোট-কর্তার মেয়েটা কি রকম রুমাল দিল, তাে
তা বেরুচ্ছে। আমারও বাবু ইচ্ছে করত টুনিকে বাস-
দিয়ে একখানা রুমাল দিতে।

তার মনে হচ্ছে, সে ভারি চমৎকার বলছে। কাঁধের
বদিন বয়ে বেড়াচ্ছে, সমস্ত যেন হালকা হয়ে গেল—দুঃখের শে
গেল আজকে, এই মুহূর্তে। এত সাহস তার এল কি করে? ে
কথা বলতে কান্না পাচ্ছে না, বিরাট সান্ত্বনা এতগুলো চে
নিঃশব্দ সহানুভূতিতে। এদেরও যেন মেয়ে মরেছে, কিম্বা মেে
মরছে—অমনি কিছু না কিছু ঘটেছে নিশ্চয়। এত লোকের
[illegible] কে মনে হচ্ছে বিপুলতারই একটি টুকরা—দৈত্যাব
মেশিনের ছোট্ট একটি নাট। একা নয় সে—অনেক মানুষের একজ
বলতে বলতে মাদারের কণ্ঠে যেন আগুন ধরে গেল। বলে, শে
ভাই, যে যেখানে আছি, আজ থেকে সবাই আমরা একজা
হলাম।

চাষীরা জবাব দেয়, ভাল—ভাল—। মাদার এরকম বলতে পারে,
তারা অবাক হয়ে গেছে। নিতান্ত সামান্য জীবন, বুদ্ধির পরিধি অতি
সঙ্কীর্ণ, পঞ্চান্ন বছর এই এক ভাবে কেটেছে, কিন্তু ইতিহাস বিবর্তিত
হচ্ছে, আর কে জানে না—তারই অংশ হয়ে কোথায় এগিয়ে
আসছে আমাদের মাদার বিশ্বাস।

থার উপর আকাশের দিকে তাকিও। যে আকাশে ঈর্ষা নয়—চাঁ
রাদের দেখা যায়। যে আকাশের লক্ষ-কোটি গ্রহ-সন্তানদের এব
মাদের ছোট্ট পৃথিবী। চাঁদ যেখানে মানুষের যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা দে
কৌতুকের হাসি হাসছে।

এই ছোট্ট পৃথিবীটাকে নূতন শতাব্দী করামলকবৎ আরও একবা
ঠোর মধ্যে এনে দিয়েছে। আরও দেশ ছিল, জাতি ছিল—সেখা
প্রতিটি প্রভাত মানুষের নব নব লাঞ্ছনা বয়ে আনত। মানুষই বা
লবে তাদের—প্রহার-পীড়নে বাঁকা-শিরদাঁড়া ভারবাহী পশুর
জ্যোতির্ধারায় মুক্তিস্নান করে আজ তারা কলঙ্কের পাঁক ধুয়ে ফেলে
চোখে উৎসাহের আলো, সামনে অফুরন্ত ভবিষ্যৎ। তাদের জীবনো
এই প্রান্তে আমাদেরও বুকে ঢেউ তুলেছে। তফাৎ নই আমরা—
পৃথিবীর এ-পাড়া ও-পাড়ার বাসিন্দা।

দুঃখের কত গল্প বলে বেড়াচ্ছি আপন-মানুষদের কাছে! দুঃ
দুঃস্বপ্ন—রাত্রি বলেই এত ভয়; উত্তর-পুরুষের ইতিহাসে এই সব
হাসির ব্যাপার। জগৎ জুড়ে শুনছ কান্নার ধ্বনি? পুরানো কা
মৃত্যু হচ্ছে, তারই শোকের কান্না; নূতন যুগের জন্ম হচ্ছে, তা
সুখের কান্না।

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা। ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরি প্রেসের পক্ষে মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাশঙ্কর বাকচি এম-এসি
-এ, মসজিদবাড়ি স্ট্রীট, কলিকাতা।